একক ১২ ❒ রামমোহন, ভূদেব, ঈশ্বরচন্দ্র

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঃ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

১২.৪ রামমোহন রায়

১২.৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১২.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আপনারা প্রথমেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সূত্রপাত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাবেন। জানবেন কি অবস্থায় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সমাজচিন্তা গড়ে উঠেছিল। অতঃপর এই এককে তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজচিন্তানায়ক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পাঠ নেবেন। আপনার জানবেন রামমোহন, ভূদেব ও ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে একইসঙ্গে সমাজসংস্কারক ও সমাজচিন্তানায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

১২.২ প্রস্তাবনা

পশ্চিমে সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে প্রধানত শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে। আর ভারতবর্ষে সমাজ-চিন্তার উদয় হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে। উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তানায়কগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিকমনস্ক মানুষ হিসাবে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর পর পরই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারক ও চিন্তানায়কগণ ভারতীয় সমাজ চিন্তার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। এই তিন জনকে আমরা তাই ভারতীয় সমাজতত্ত্বের / সমাজবিজ্ঞানের তিন পথিকৃৎ বলে গণ্য করতে পারি।

১২.৩ সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রপাত : প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে

ভারতের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে। অবশ্য প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শাস্ত্রকার, মহাকাব্য রচয়িতা, তত্ত্বজ্ঞানীদের লেখায় এবং বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা ও পরিচালকদের রচনা ও আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব বিচার বিশ্লেষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির তুলনায় পরম্পরাগত মূল্যবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার যথার্থ সম্পর্কে আস্থার প্রকাশই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষের ফলে এই আস্থায় চিড় ধরেছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

নতুন ধরণের চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছিল। প্রতীচ্যে জ্ঞানচর্চ্চার স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সোসিওলজি বা সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীতেই। যদিও তাদের পরিপ্রেক্ষিত ছিল ভিন্নতর। পশ্চিমী সমাজ ও ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ও বিকাশে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার ছাপ পড়েছিল ঐ দুই ক্ষেত্রের সমাজবিজ্ঞান বিকাশের উপরেও।

পাশ্চাত্যে সমাজবিজ্ঞানের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য :

চার ধরনের বিপ্লবের ফলে পশ্চিমের বিশেষতঃ ইউরোপের সমাজ কাঠামো ও মূল্যবোধে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। অনুরূপ বিপ্লব প্রাচ্যের সমাজগুলিতে সমকালে ঘটেনি। এগুলি হল (১) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, (২) বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, যার প্রকাশ রেনেসাঁস ও পুর্নজাগরণ এবং মানবতাবাদের উদ্বোধনে (৩) ফরাসী বিপ্লবের মত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ঘটনায় এবং (৪) শিল্পবিপ্লবে।

(১) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে

চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের উৎপাদকেরা বিশেষতঃ বণিকজন তাদের পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজারের খোঁজে তাদের নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে স্থলপথে ও জলপথে নতুন নতুন দেশ ও মানবগোষ্ঠী আবিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিল। তারা ধীরে ধীরে সেই সব দেশে নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সেখানে ইউরোপীয় বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।

(১) বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণ ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

পশ্চিমী জগতের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগে চার্চ এর ধর্মগুরু বা পাদ্রীদের কঠিন শাসনে মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ও সৃষ্টিশীলতা প্রবলভাবে ব্যাহত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসস্বরূপ গ্রীক সভ্যতার উৎকর্ষের মূলে নিহিত ছিল মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ পশ্চিমী মানুষের বোধে নতুন করে প্রতিভাত হল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। এই প্রক্রিয়া ও ঘটনা রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, যুক্তিসিদ্ধ মননে ঋদ্ধ, নিত্যনবসৃষ্টি অভিলাষী, নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়াসী ব্যক্তি মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি, তার সচেতনতা, সাহস ও কর্মোদ্যোগই এই পুনর্জাগরণের মূল কথা। এর ফলেই চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্যে দেখা দিল নব নব সৃষ্টির উল্লাস। আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা দিল নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ লব্ধ এবং যুক্তিবিচার সিদ্ধ তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী সমস্ত ধরণের প্রচলিত মতবাদ, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসকে অতিক্রম করার প্রয়াস। দৈবকরুণা বা প্রাকৃতিক শক্তির দাসত্ব ঘুচিয়ে মানুষ প্রকৃতির নানা দিকের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা শুরু করল আপন বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে।

(৩) ফরাসী বিপ্লব ও রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ফলে প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। রাজতন্ত্র, পাদ্রীতন্ত্র ও অভিজাতবর্গের জায়গায় স্বার্থ নির্ভর সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এল সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মানবতাবাদ। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল এই ফরাসী বিপ্লবের ফলেই। একই সঙ্গে পুরোনো সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধকে শাশ্বত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল মানুষ। যুক্তির আলোকে (এনলাইটেনমেন্ট) প্রদীপ্ত মন নিয়েই সব কিছুকে বিচার করতে

হবে। এই বিচারে অনুত্তীর্ণ, সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শকে বিসর্জন দিতে হবে নির্দ্বিধায়। আবার এই প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠায় একধরনের কালাপাহাড়ি মনোভাবেরও জন্ম হল যা পুরাতন সব কিছুকেই জীর্ণ বলে বর্জন করতে উদ্যোগী হল। সামাজিক অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ বিপন্ন হয়ে পড়ল। তাই নতুন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও পুরাতনের যে অংশ মানুষ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার নায়কগণ। নূতন ও পুরাতনের এই দ্বন্দ্ব আরও প্রখর হল শিল্পবিপ্লবের ফলে।

(৪) শিল্প বিপ্লব

মোটামুটিভাবে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং তা দ্রুত প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও সংঘটিত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের আগে ছিল হস্তচালিত সরল যন্ত্রপাতি এবং প্রাণীশক্তি ও কায়িকশক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা। এগুলির জায়গায় এল বাষ্পচালিত জটিল ও আগের তুলনায় অধিকতর উৎপাদনক্ষম ও বেগবান যন্ত্রপাতি এবং বৃহত্তর আয়তনবিশিষ্ট এবং উন্নততর উৎপাদন কাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কৃষিভিত্তিক ও গিল্ড বা কারিগরগোষ্ঠী/শ্রেণী নির্ভর শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা। পূর্বে কৃষক ও শ্রমজীবী কারিগররা স্থায়ীভাবে বাঁধা ছিল জমিদার ও গিল্ড অধিপতিদের সাথে। নতুন ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক সর্ব্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী মালিকের কাছে তার শ্রম বিক্রয়ের স্বাধীনতা অর্জন করল। সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যূথবদ্ধতার উপরে স্থান পেল। অন্যদিকে মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের ক্রমাগত শোষণের ফলে সমাজে দেখা দিল অশান্তি এবং শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব। ক্রমে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রের সূচনা দেখা দিল।

উপরে আলোচিত চার প্রকারের বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার সাবেকী সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতি (মূল্যবোধ, আদর্শ ও বিশ্বাস) নতুন নতুন চিন্তাধারা ও ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। ভেঙ্গে পড়া পুরোনো ব্যবস্থার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আর রইল না। আবার নবজাত ব্যবস্থার জটিলতা ও প্রবল গতিশীলতার চরিত্রও সম্যক বোধগম্য হচ্ছিল না প্রতিটি ক্ষেত্রে। নূতন ও দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল সমাজের গতিময়তার সাথে সমাজের সুস্থিতি ও শৃঙ্খলা কীভাবে মেলানো যাবে, নতুন সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজ সংহতির সমন্বয় কীভাবে সম্ভবপর হবে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে—এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই প্রতীচ্যে জন্ম হয়েছিল সোসিওলজি বা সমাজবিজ্ঞানের। আর জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির প্রধান হাতিয়ার ছিল মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও শক্তির উপরে আস্থা এবং যুক্তি নির্ভর বিচার ও বিশ্লেষণ প্রণালী। সমাজ ও সংস্কৃতিকে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা শুরু হল।

ভারতে সমাজ বিজ্ঞান : সূচনা ও বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমের (ইউরোপের) সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ তীব্রতর হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের পত্তনের ঠিক পর থেকেই। এর আগের কয়েকটি শতকে পশ্চিমের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমূল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছিল। অনুরূপ পরিবর্ত্তন ভারতে ঘটে নি। ভারতবর্ষে সমাজ ও মূল্যবোধের পরম্পরা বা ঐতিহ্যের চাপ অব্যাহত ছিল। তার মুখ্য চারটি কারণ হল—

ক) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি

খ) এক প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ। যা অবশ্য কখনই সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না।

(গ) বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজশাসন যাতে জন্মগত জাতি (কাস্ট)-র কর্ম বিভাজন ও অধিকারভেদ যুক্ত হয়েছিল যজমানি ব্যবস্থার সাথে, যার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে জাতিগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা নিশ্চিত হয়েছিল।

ঘ) পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ এর ভাবগত ধারণা।

উপরোক্ত চারটি কারণে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এক ধরণের স্থায়িত্ব লাভ করেছিল যা ক্রমে স্থবিরত্বে পর্যবসতি হয়। পরম্পরাগত সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রশ্নহীন আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে নানা ধরণের অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিল সমাজে—যেমন অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ, পুরুষদের বিশেষতঃ কুলীনদের বহুপ-ী গ্রহণের প্রথা ইত্যাদি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাধারণের জন্য শিক্ষার অভাব। এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আঘাত এল ব্রিটিশ শাসনকালে। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সমাগত প্রতীচ্যের দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতাবাদ এদেশের সংস্কৃতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করল। আর ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থে তথাকথিত স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমাজভিত্তিক অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করল। টলিয়ে দিল।

প্রচলিত ধ্যানধারণা, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা শুরু হল রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারকদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। এরা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে সোসিওলজিস্ট বা সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না। কারণ এঁদের জন্মকালে সমাজবিজ্ঞান বা সোসিওলজি জ্ঞানচর্চ্চার আলাদা শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি এদেশে, এমন কি পশ্চিমেও। কোনও রকম সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সমাজ ও সংস্কৃতির সমালোচনা করার ক্ষমতা ও শৈলীই সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান। তাই এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে প্রচলিত সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধরণের মনীষীরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, যে ধরণের সমালোচনা করেছেন তার দ্বারাই ভারতের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চ্চার বীজ বপন করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনার ধারা আরও বেগবতী হয়। এঁদের চিন্তাধারা ও কর্মক্ষেত্র অবশ্যই সমাজতাত্ত্বিকের গণ্ডী পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ববিদ্গণের উপর এঁদের প্রভাব পড়ল গভীরভাবে।

বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে এল নতুন জোয়ার বা এক প্রকার নবজাগরণ। প্রচলিত ধ্যানধারণা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে বিজ্ঞানসম্মত মানবতাবাদ (সায়েন্টিফিক হিউম্যানিজম)-এর আলোকে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে প্রয়াসী হল পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সদ্য আলোকপ্রাপ্ত যুক্তিবাদী মানুষ। মূঢ়তা ও অন্ধতাপ্রসূত বিধি-প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সমাজজীবনকে সুস্থ সবল করার প্রচেষ্টা শুরু হল।

কিন্তু রক্ষণশীলরা সহজে এ পরিবর্ত্তন মেনে নেয়নি। তদুপরি সমাজ সমালোচনার প্রথম প্রচেষ্টার উচ্ছ্বাসে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকবৃন্দের একাংশ, যেমন হিন্দু কলেজ কেন্দ্রিক ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, কিছু কিছু বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলল। ফলে রক্ষণশীল সমাজ প্রবলতরভাবে বিরূপ হয়ে পড়ল নতুন শিক্ষা ও সমাজভাবনা সম্পর্কে। প্রতীচ্য থেকে আগত আধুনিকতার সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রচণ্ড সংঘাতে আধুনিকতার গতি ব্যাহত হল। চিন্তাক্ষেত্রে বিকাশশীল, আধুনিকতাকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ, অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক স্বাধীনতার অভাব ও আধুনিকতার রুদ্ধগতির একটা বড় কারণ ছিল। পাশাপাশি আধুনিকতার নামে পরম্পরাগত

সমাজশৃঙ্খলাকে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দেওয়াকে অযৌক্তিক বলে মনে করেছিলেন বেশ কিছু চিন্তাশীল মানুষ। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজকল্যাণের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাকে ফিরে দেখাতে চাইলেন তাঁরা। এদেশে বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লুণ্ঠণের ব্যাপারটাও তাঁরা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। আমাদের নিজেদের সমাজ ও মূল্যবোধকে ব্রিটিশ শাসক ও তার অনুগামী বা সমর্থক পশ্চিমী পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করার (ওরিয়েন্টালিজম) যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠল। ভারতীয় সমাজতত্ত্ব আজও এই সমস্ত সমস্যার সমাধ্যনে ব্যস্ত। ভারতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিথষ্ক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন আজকের দিনেও ভারতীয় সমাজতত্বের একটি মুখ্য কর্ত্তব্য। এ কাজ যাঁদের হাতে শুরু হয়েছিল তাঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিতি একান্ত প্রয়োজনীয় এদেশের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। এই সঙ্গে স্মরণীয় ভারতপ্রেমিক বিদেশী পন্ডিত ও গবেষকবর্গ, এশিয়াটিক সোসাইটী ও বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়শনের মত আলোচনা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী আমলাদের প্রতিবেদন। এছাড়া সেন্সাস বা জনগণনার প্রতিবেদন এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছে তা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের তথ্যগত বা বস্তুগত (এম্‌পিরিকাল) ভিত্তিগঠনে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Coser, L.A. *Masters of Sociological Thought,* Jaipur 1988

২। ঘোষ, বিনয়— বাংলার নবজাগৃতি কলিকাতা

৩। পোদ্দার, অরবিন্দ — *Renaissance in Bengal* : Quests & Confrontations. Simla : 1970.

১২.৪ রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

ভারতে আধুনিকতার উদ্‌গাতা রামমোহন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। আধুকিতার প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিচেতনার জাগরণ যা পশ্চিমে দেখা গিয়েছিল মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের ফলে— ব্যক্তিচেতনার জাগরণ বলতে অবশ্য নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তোলা ও তার চরিতার্থতা সাধনকে বোঝায় না। নিজের মন, বোধ, বুদ্ধির সবটাই গীর্জা বা পুরোহিততন্ত্র বা সমাজপতিদের কাছে বাঁধা না রেখে সমস্ত কিছুকেই নিজের বোধ বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও সেই অনুযায়ী কাজ করার যোগ্যতা অর্জন ও উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিচেতনার জাগরণ ও আধুনিকতার সূচনা হয়। আধুনিকতার প্রাক্কালে মানুষ নিজেকে জানত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একজন বলে, কোনও চার্চ বা ধর্মসঙ্ঘের অনুগামী বলে। তার নিজের কোনও আত্মিক পরিচয় ছিল না। রামমোহনের আবির্ভাবকালে ভারতবাসীদের মধ্যে কেউ ছিল হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র, কেউ বা অস্পৃশ্য, কেউ শক্তি, কেউ বৈষ্ণব, কেউ বা সুন্নী। মানুষ জানত এই রকমই তার পরিচয়। এর অবসান তখনই সম্ভব যখন আপন চিন্তা ও কর্মের উপর ব্যক্তির নিজের বিচার বুদ্ধি ও যুক্তির সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়া মূর্ত হয় প্রথম রামমোহনের ক্ষেত্রে। ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামমোহন বলেছিলেন যে উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে "আমি নিজের বিবেকের দ্বারাই চালিত হয়েছি, অভিজ্ঞতার ও চিন্তার দ্বারা চালিত হয়েছি" (I have been guided only by my conscience and the impressions left on my mind by long experience and reflections)।

ব্যক্তিমনের স্বতন্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ বিচারক্ষমতা এবং মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতার ভিত্তিতেই রামমোহন ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লষণ করতে পেরেছিলেন।

জাতিভেদের কুফল

রামমোহন স্পষ্ট করে দেখালেন যে তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুদের ধর্মভাবনা, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও সামাজিক ব্যবস্থা নতুন জীবন স্বপ্নের উপযোগী নয়। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর সমকালে হিন্দুদের ধর্ম ব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে না। জাতিভেদের বৈষম্য জনগণের মধ্যে অসংখ্য ভাগ ও বিভাগের সৃষ্টি করেছে। তার ফলে এদেশের অধিবাসীরা স্বাদেশিকতার বোধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অসংখ্য ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান এবং শুচিতা রক্ষার জন্য রীতি-রেওয়াজ মেনে চলতে গিয়ে যে কোন প্রকার কঠিন কাজ করার শক্তি ভারতবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে। নবযুগের সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং সামাজিক হিতের জন্যই হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত ধ্যানধারনা,আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন দরকার।

প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,আচার-অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্রের দুষ্ক্রিয়া

সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাই রামমোহন সমাজ পরিবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে দেশবাসীকে শাস্ত্রচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে সত্য প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের অনুবাদও বিতরণ করেছিলেন। গুরুগিরির ব্যবসায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখের কথাকে শিরোধার্য না করে

জিজ্ঞাসুর আপন অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রকে বোঝার ও বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন রামমোহন। তিনি দেখিয়েছিলেন নানারকম আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়ে, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার নির্দেশ দিয়ে, পালপার্বণ দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কীভাবে সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারণা করে, শোষণ করে। এই কারণেই তিনি পৌত্তলিকতা ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সতীদাহ নিবারণের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত প্রচেষ্টা

সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মৃত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবার প্রাণ বিসর্জনের যে অমানবিক প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা রদ করার জন্য তিনি সমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রক্ষণশীলদের জোরালো সমর্থনে এই নারীহত্যা বঙ্গদেশে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। আর ব্রিটিশ শাসকরাও দেশীয় লোকেদের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় এই ব্যবস্থার অবসানে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। নারীসত্বা বিধ্বংসী এই ব্যবস্থা রদের অনুকূলে একদিকে দেশবাসীর ও অন্যদিকে বিদেশী শাসকবর্গের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য রামমোহন তিনখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের বচনসমূহ উদ্ধৃত করে, তাদের যুক্তিনিষ্ঠ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে ধর্মশাস্ত্রে সতীদাহ প্রথার অনুমোদন মেলে না বরং তার বিপরীত কথাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

তিনি আরও দেখালেন সতীদাহ প্রথার মধ্যে বিধবা নারীদের ভরণপোষণে তাদের আত্মীয়স্বজনের বিমুখতা ও তাদের সম্পত্তির ওপরে আত্মীয়স্বজনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই প্রকট হয়।

এই প্রথা রদের জন্য ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন পাশ হয়। এই আইন রদের জন্য রক্ষণশীলরা সরকারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করলে তার বিরোধিতায় রামমোহন সরকারকে অভিনন্দন জানান। সতীদাহ নিরোধ আইন নিয়ে মামলা শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলে যায়। সেখানে শুনানীর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ সালে আইনটির বৈধতা স্বীকার করে নেন। সতীহাদ নিবারণের জন্য দীর্ঘ দুই দশক ধরে রামমোহনের তত্ত্বগত আলোচনা ও বাস্তবে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্ততঃ একটা কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনায় কুশল এই তাত্ত্বিক সমাজের অসুবিধা নিরাকরণের জন্য উপযুক্ত বাতব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

নারীর মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষা ও বহুবিবাহ রোধের চেষ্টা

পরম্পরাগত সমাজে সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা যে চরম বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন রামমোহন তারও প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষদের বহুবিবাহ করার অধিকারের মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন নারীর মর্যাদাহানির আর একটি দুঃখজনক উদাহরণ। তাই এই প্রথা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা ও অন্য ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চনাই আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক হীনাবস্থার কারণ বলে তিনি নির্দেশ করেছেন।

সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন

তীক্ষ্ণ সমাজ বিশ্লেষণের সাহায্যে রামমোহন বুঝেছিলেন যে এদেশে গতানুগতিক চিন্তাধারা ও প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের অবসানের জন্য ইউরোপের তুলনামূলকভাবে উদার ও যুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রয়োজন। তাই সংস্কৃত ও শাস্ত্র ও বেদান্ত চর্চার বদলে পাশ্চাত্যের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এবং অন্যান্য

কার্যকরী বা জনহিতকার শিল্পচর্চার ব্যবস্থা করার জন্য শাসকবৃন্দকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন রামমোহন। এই কারণেই সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন তিনি। তবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রচলিত চতুষ্পাঠীগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করার জন্য তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

রামমোহন নিজেকে ভূম্যধিকারী অভিজাতদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীস্বার্থকে অতিক্রম করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করার ফলেই কোম্পানীর শাসনকালে ভূমি ব্যবস্থা ও চাষীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছিলেন রামমোহন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৮৩১ সালে বৃটিশ সরকার একটি সমীক্ষা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর লিখিত সাক্ষ্য ও প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন যে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা ও দক্ষিণ ভাতের রামতওয়ারী বন্দোবস্ত উভয়ই ছিল সবল কর্ত্তৃক দুর্বলকে শোষণের পন্থা—একটিতে জমিদারের হাতে চাষী নির্যাতিত হয়েছে, অন্যটিতে সরকারী কর্মচারীর, যেমন জরীপকারী ও রাজস্ব আদায়কারীর, হাতে। সরকার জমিদারদের ক্ষেত্রে রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট হার স্থির করে দিয়ে তাদের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অনুরূপ সহানুভূতির সঙ্গে চাষীদের অবস্থা কেন বিবেচনা করা হয়নি তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চাষীদের নানাধরণের অত্যাচার, হেনস্থা, শোষণের, বঞ্চনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। আর এই অব্যবস্থা ও দুর্দশার প্রতিকারের পথ নির্দেশও করেছিলেন রামমোহন। রামমোহন নিজে কিন্তু নির্যাতিত দরিদ্র কৃষকদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন নগরবাসী উচ্চবিত্ত শ্রেণী লোক। তিনি ভূসম্পত্তির মালিকও হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অশেষ সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অতীব কাখিত। শুধু তাই নয়, অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্তের মতে রামমোহনের হাতে "ভারতের অর্থনীতি আলোচনা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করল। এও উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যেএকটি স্বচ্ছন্দ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহলে চাষীর খাজনারও চিরসথায়ী বন্দোবস্ত হোক। যদি চাষীর খাজনা আর না বাড়ানো হয়, তাহলে জমিদারের দেয় রাজস্ব কিছু কমানো হোক। যদি এর ফলে সরকারী আয়-ব্যয় ঘাটতি পড়ে, তাহলে নতুন শুল্ক বসানো হোক এবং ভারতীয় কর্মচারী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করে ব্যয় কামানো হোক। ব্যয় কমানো হোক দেশের প্রশাসনে, ব্যয় কমানো হোকবিদেশে পেনসন সুদ ইত্যাদির অপচয় হ্রাসে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ব্যয় করা হোক দ্রুত হারে এবং এর জন্য ইংরেজদের এখানে আমন্ত্রণ করা হোক প্রশাসক রূপে নয়, আর্থিক উন্নতির পরিদর্শক স্থায়ী বাসিন্দা রূপে। যুক্তিধারা চলে এসেছে এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে। এখানেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনের পরিচয়।"

বিভিন্ন ধর্মমতের যুক্তিসিদ্ধ ও তুলনামূলক আলোচনা

রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ ও বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সূত্রপাত করেছিলেন এদেশে। তাঁর মতামত বর্তমান যুগে ধর্মের সমাজতত্ত্বের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা নানা গবেষণা এবং বিভিন্ন ধর্মমতের আলোয় পৌত্তলিকতাকে যাচাই করেছিলেন। তাঁর আরবী ভাষায় রচিত "মানজারাতুল, আদিয়ান্" "নানা ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আজ আর পাওয়া যায় না। তাঁর ফারসী ভাষায় রচিত"তুহফত্-উল-মুওয়াহিদ্দিন" নামে পুস্তিকাটিতেও তিনি একাধিক ধর্মমত ও ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণে যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা

করেছেন। এই রচনায় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় রামমোহন

রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যাতে লোকহিতকে অবজ্ঞা না করতে পারে তার জন্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। স্বাধীন সংবাদপত্র শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে তিনি একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রেস রেগুলেশন' কার্যকরী করা হলে রামমোহন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ফারসী ভাষায় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। বিশ্বের যে কোনও জায়গায় যে কোনও ধরণের স্বৈরাচারের বিরোধী ছিলেন তিনি। প্রকৃত গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে না এই বিশ্বাসেই তিনি স্বদেশে গণতান্ত্রিক ব্রিটিশদের শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন পশ্চিমী সভ্যতার ও সংস্কৃতির অভিঘাতে এদেশের জনগণের পরম্পরাগত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের অচলায়তন থেকে মুক্তি ঘটবে এবং তারা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করবে।

হিন্দু মুসলমান সব ধরণের ভারতীয়দের তুলনায় নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী খ্রীষ্টান পাদ্রী বা ইউরোপীয় আধিকারকরা করত রামমোহন সারা জীবন তার প্রতিবাদ করে গেছেন। প্রকৃত উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরমতসহিষ্ণু রামমোহন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুক্তিভিত্তিক মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন সামাজিক সংরচনায়। এই মেলবন্ধনের সাধনের জন্য রামমোহনের ধারণা ও পদ্ধতি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Datta Gupta, Bela *sociology in India,* Calcutta 1972.
2. Poddar, Arabinda, *Renaissance inBengal : Quests and Confrontations 1800-1860.* simla : 1970.
3. Ray, Raja Rammohun *Selected works of Raja Rammohan* New Delhi : 1977.

১২.৫ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)

প্রস্তাবনা : ভারতে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশে যে কয়জন পথিকৃৎ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য সর্বজনীন সাধারণ সত্যের প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম চিন্তা ভাবনা করেন।

উদ্দেশ্য : এককের এই অংশটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৩÷১ — ভূদেবের জীবনের মুখ্য কয়েকটি দিক

৩÷২ — সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা বিচার

৩÷৩ — সমাজ ও তার ইতিহাসের পদ্ধতি

৩÷৪ — ভারতীয় সমাজের

ক) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

খ) দেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের যোগাযোগের জন্য একটি জাতীয় ভাষা

গ) বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন ও অস্পৃশ্যতার বিরোধীতা

ক:৩:১ — ভূদেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জন্ম, শিক্ষা এবং মানসিকতায় ভূদেব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সামাজের একাত্ম ছিলেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ মুখোপাধায় সংস্কৃতে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। এই দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজের সমাজের নিন্দাবাদ করতে অস্বীকার করে তিনি দারিদ্র্য বরণ করেন। কিন্তু পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। নয় বছর বয়সে ভূদেব কলিকাতা গর্ভমেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ইংরেজী শেখার জন্য শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন বারো বছর বয়সে। তখন সেখানে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রাধান্য। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে হিন্দু আচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করত তারা। তাঁর পুত্র ও হয়ত নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করবে— বিশ্বনাথ এই উদ্বেগ প্রকাশ করায় ভূদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে পিতার সামনে গ্রহণ করতে পারবেন না এমন কোনো খাদ্য তিনি কোনওদিন স্পর্শ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা ভূদেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর কঠোর নিষ্ঠা ও আত্মসংযমের কথা সমকালীন বন্ধুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে পৌত্তলিকতায় অনাস্থা প্রকাশ করে ভূদেব গৃহে নিত্য পূজায় অংশ গ্রহণ করতে আপত্তি জানালে বিশ্বনাথ বিচলিত হন বটে। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ভূদেবকে অবিশ্বাস সত্ত্বেও নিত্যপূজা করতে বাধ্য করেন নি। দীর্ঘদিন ধৈর্য্যের সাথে প্রতীক পূজার তত্ত্ব সম্পর্কে পুত্রের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পুত্র কলেজে যে সমস্ত বিষয় শিখে আসতে তাদের অনুরূপ ভাব ও ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে শোনাতেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ। হিউম, টম পেইন এবং গিবন পড়ার ফলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ভূদেবের আকর্ষণ কমে যায়, তার উপর বিশ্বনাথের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার ফলে পিতৃপুরুষের ধর্মে তাঁর আস্থা ফিরে আসে। কুলধর্ম অনুযায়ী তন্ত্রমতে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করায় ঐ আস্থা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।

১৬ বছর বয়সে ভূদেবের বিবাহ হয়। ভূদেবের বালিকা বধূ শ্বশুরকূলে তাঁর পূর্বগামিনীদের মত আদর্শ গৃহিনী

ও স্বামীর প্রিয় সহচারীরূপে বিকশিত হয়েছিলেন। ভূদেবকেও তাঁর পিতা ও পিতামহের মত মধ্যবয়সে পত্নীবিয়োগের শোক সহ্য করতে হয়। তাঁদের মত তিনিও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। নিজের পরিবারের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার কারণেই সমাজসংস্কারকদের বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে তিনি উৎসাহ দেখাতে পারেন নি।

হিন্দু কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ভূদেব। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন তিনি। এক বছর পরেই তিনি ফরাসী চন্দননগর সেমিনারী নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকপদে যোগাদন করেন। এখানে ইসলাম সংস্কৃতি ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ এর অন্যতম কারণ। এই পদ থেকে আপন যোগ্যতাবলে তিনি শিক্ষা বিভাগের স্কুল পরিদর্শক এবং শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল এডুকেশনার সার্ভিসের প্রথম শ্রেণী পদাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠি করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেফটেনেন্ট গর্ভনরের কাউন্সিল বা পরিষদের সদস্য হন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী শিক্ষাবিষয়ক বহু রিপোর্টের তিনি রচয়িতা। ভারত সরকারের দ্বারা গঠিত হান্টারের শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন ভূদেব। তাঁর সম্পাদিত 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার', 'এডুকেশন গেজেট' বাংলার তখনকার সামাজিক ও অন্য নানাধরণের ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য দর্পণ ও যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর রচিত **সামাজিক প্রবন্ধ** ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এদেশে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূচনা করেছিল।

ক:৩:২ — (১) ঐতিহ্যের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় ভূদেব

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজবীক্ষার যে সমালোচনাত্মক ধারা গড়ে তুলেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই ধারাকে অনুসরণ করেন নি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় এবং জনসমাজে আলাপ আলোচনায় সনাতন ধর্মশাসিত হিন্দুসমাজের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বস্তুতঃ ভূদেবের সমাজ দর্শনে আমরা ঐতিহ্যের সানুরাগ কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনা পাই। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য ভাবধারায় আপ্লুত্য নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদের হিন্দু রীতিনীতির বিদ্বিষ্ট সমালোচনা এক বিষম সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যাভিমান হারিয়ে দেশের একাংশ বিদশী শাসকবর্গ ও তাদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণকারীতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ঐতিহ্য বা পরম্পরাকে নির্বিচারে বিসর্জন না দিয়ে তার গতিপ্রকৃতি বুঝে সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টা তাই ভূদেবের কাছে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়েছিল।

ক:৩:২ — (২) ভূদেবের চিন্তায় পুনরুজ্জীবনবাদের অনুপস্থিতি

ঐতিহ্যের বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের সানুরাগ কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ এই ব্যাখ্যায় ভূদেব পুনরুজ্জীবনবাদকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ ভক্তরা হিন্দু রীতিনীতির বিদ্বিষ্ট সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। এটি একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরাই শ্রেষ্ঠ আর্য, শুধু তাই নয় তারা প্রকৃত আর্য রক্তের অধিকারী। এই মতানুসারে প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতিগুলি যুক্তিসঙ্গত তো বটেই, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। আধুনিক পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের (যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুচ্চম্বক তত্ত্বের) অপব্যাখ্যা দিয়ে এইসব মতবাদ উপস্থাপন করা হত। ভূদেব এই ধরণের মতামত সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করতেন ভালমন্দ বিচার না করেই সবকিছু গ্রহণ করাও যেমন, তেমনই কোনো পরিবর্ত্তন

মেনে না নেওয়াও কুসংস্কার পদবাচ্য। আর তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুদের সমাজ অধঃপাতিত বা মুমূর্ষ হয়ে পড়ে নি কখনও। অতএব হিন্দুধর্ম বা সমাজের পুনরুজ্জীবনের কথাই ওঠে না। হিন্দু সমাজ স্থানু বা অনড় ছিল না। ভূদেব দেখিয়েছেন যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন নতুন প্রয়োজন অনুসারে পণ্ডিতরা বার বার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। উন্নতির পথ খুঁজতে গেলে এই সুপরীক্ষিত পথের কথা ভুললে চলবে না। বস্তুতঃ ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা মাত্রই অবৈজ্ঞানিক নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন ভূদেবকে ব্রতী হতে হয়েছিল। এটা ঠিক যে এই মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য ধর্মের অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মূল্যায়নের মানদন্ডটা কী হবে ?

রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্যের মানদন্ডে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন। ভূদেব এই প্রচেষ্টাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হলে এই ধর্ম কীভাবে যুগযুগান্ত ধরে এদেশের মানুষকে বন্ধনে বেঁধে রেখেছে এবং তাদের একজাতিত্বভাব রক্ষা করেছে সেটা বুঝতে হবে। ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দুদের জাতীয়ভাব বুঝতে হবে এবং সেটা করতে হলে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অন্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের তুলনা করা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে এই তুলনা সম্ভব সেই সম্পর্কে ভূদেবের চিন্তাভাবনা এদেশে সমাজতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩:২ — (৩) সমাজ ও ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং সর্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্বের সম্ভাব্যতা বিচার

এদেশে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম সরাসরি সমাজের ও সংস্কৃতির প্রকৃতি, পরিবারের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সুগ্রথিত প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। এগুলিই **সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ** এবং **আচার প্রবন্ধ** শীর্ষক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর **বিবিধ প্রবন্ধ**-তে ও সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর আলোচনা পাওয়া যায়। অবশ্য এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মূল্য উপজীব্য ভারতীয় সমাজের জাতীয়ভাব এবং এই জাতীয়ভাবের সৃষ্টিতে সনাতন ধর্মের ভূমিকা। এই আলোচনা করতে গিয়ে ভূদেব ভারতের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আলোচনা করেছেন এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তুলনা করেছেন। এতৎ সত্ত্বেও কিন্তু ভূদেব তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝেছিলেন যে তাঁর **সামাজিক প্রবন্ধ** বা অন্য গ্রন্থগুলি 'সর্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্বের' আদর্শ উদাহরণ নয়।' বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবস্থা আচার আচরণ, ধ্যান ধারমার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আহরণ করে সেগুলিকে সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করার পরেই এই ধরণের সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ রচনা সম্ভব। যে কোনও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির যথার্থবোধের জন্য সেখানকার ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য (অর্থাৎ বাস্তবে পরম্পরাক্রমে যা ঘটেছে ও ঘটছে তার প্রকৃত বৃত্তান্ত বা খোঁজখবর) এর প্রয়োজন। এর জন্য চাই মুক্ত দৃষ্টি। অথচ ভূদেব লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সময়ে তাঁর সমাজের ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যেই এই সম্পর্কে তথ্যজ্ঞান ছিল অস্ফুট। পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার মূল যে যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত সেই ঐতিহ্যের পরিশ্রমসাধ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে তাকে সদ্য জানা পশ্চিমী সমাজব্যবস্থা ও ধর্মের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল তারা। চল্তি হাওয়ার পন্থী এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিতরা পরম্পরাগত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘনকেই প্রগতি বলে মনে

করেছিল। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও কোনও মঙ্গল সাধন করে না। আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় যে ভূদেব পরম্পরাগত সমাজের ও মূল্যবোধের ক্রিয়াত্মক দিকটি দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক দেশের ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠান সেই দেশের জনসমষ্টির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বা পরিবেশগত অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতার দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়। কোনো বিশেষ জনসমষ্টির ঐতিহাসিক, পরিবেশগত ও অন্যবিধ অভিজ্ঞতা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয় তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। এই ঐতিহ্যই তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যই জাতি হিসাবে তাদের বিশিষ্ট পরিচয়। পরানুচিকীর্ষার ফলে এই ঐতিহ্যের অবমাননা বা ধ্বংসসাধন জাতির স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ সাধন করে। জাতীয়তাবোধের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমির অন্যতম প্রথম বিশ্লেষণকারী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাই সমাজ সংস্কারের নামে কালাপাহাড়ি মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সমাজের কোনও প্রতিষ্ঠান বা আচার অনুষ্ঠান বদলানোর চেষ্টা করার আগে জনসমষ্টির জাতীয়ভাব ও সমাজের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্রিয়া ও দুষ্ক্রিয়া ও প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া ও দুষ্ক্রিয়াকে বিচার করে দেখতে হবে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম পরিচালিত হিন্দু সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভূদেব এইটিই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।

৩:২ — (৪) পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ-এ প্রকাশিত ভূদেবের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অখণ্ডতা

একথা সত্যি যে আজকাল আমরা সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান বলতে যা বুঝি ভূদেবের **সামাজিক প্রবন্ধ** সেই জাতীয় গ্রন্থ নয়। কিন্তু এই গ্রন্থটি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **পারিবারিক প্রবন্ধ** এবং **আচার প্রবন্ধ**-এর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান মেলে। বর্তমান অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে পরিবারই বৃহত্তর সমাজের ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। সমাজ আন্তঃমানবিক সম্পর্কের জটাজাল। আর এই সমাজের সদস্যদের সেই পারস্পরিক অধিকাংশ সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনের জ্ঞাতি বা রক্ত সম্পর্ক, বিবাহ ও কুটুম্ব সম্পর্ক এবং কর্ত্তব্য সম্পর্কের মধ্যে থেকেই হয়। পরিবার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমাজ অঙ্গী। এই দিক থেকে পরিবারকে কেন্দ্র করে ভূদেবের সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা খুবই যুক্তিযুক্ত। তাই তাঁর **পারিবারিক প্রবন্ধ সামাজিক প্রবন্ধেরই** অঙ্গবিশেষ। ভূদেব নিজে বলেছেন যে **পারিবারিক প্রবন্ধের** অনেক জায়গাতেই সামাজিক প্রভাব চলে এসেছে। বিশেষতঃ ‘ধর্মচর্চা’ এবং ‘সন্তানের শিক্ষা’ এই দুটি প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন তাতে “সমাজকেই প্রধানতম উদ্দেশ্য” বলে বিবেচনা করা হয়েছে। **পারিবারিক প্রবন্ধ** লিখতে গিয়েই ভূদেব **সামাজিক প্রবন্ধ** রচনায় অনুপ্রাণিত হন। **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে ইংরেজেরা এদেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করার পরে এদেশীয়দের জাতীয়ভাবের উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রসার এই বিষয়ই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। **পারিবারিক প্রবন্ধ**-তে ও নানা স্থানে এই ভাবই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সামাজিক প্রবন্ধ-তে ভূদেব ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে অন্যান্য দেশ ও জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজের তুলনা করেছেন। **পারিবারিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ** কিন্তু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের জন্য লিখিত হয়েছিল। এই দুই রচনাকে বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় গৃহ্যসূত্র বলা যেতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের যে ভাবে বোঝা উচিত সেই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে এই দুই গ্রন্থে। পার্থক্য শুধু এই যে **আচার প্রবন্ধ**-এর মূল হিন্দুশাস্ত্র, **পারিবারিক প্রবন্ধ**-এর মূল বাঙালি হিন্দুর দেশাচার

পারিবারিক প্রবন্ধ-তে ভূদেব বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির দৃঢ় ভিত্তি। বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতামাতা,

পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, অন্যান্য সামাজিক কর্তব্য কেনো কিছুই ভূদেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। পারিবারিক জীবনে মোটামুটি রক্ষণশীল হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কার মুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার বা যৌথ পরিবারের এক আদর্শ চিত্র ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ গবেষকই আজও অঙ্কন করেন। ভূদেব কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। একান্নবর্তিতার গুণ হল- এর ফলে বশ্যতা বা আনুগত্য, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা জন্মায়। কিন্তু ভূদেবের মতে অনেক ক্ষেত্রে একান্নবর্ত্তিতার মূল কারণ দরিদ্রতা। এর ফলে একজনের উপর নির্ভরশীলতা জন্মায় এবং পরিবারের অন্যান্যের মধ্যে উপার্জন করার ইচ্ছা কমে আসে। সেই জন্য তিনি বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রশংসা করে সেই অনুযায়ী পিতার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে চলা সুযোগ দানের কথা বলেছেন। বিরোধের উৎসে সম্পত্তি। সম্পত্তির সুষ্ঠু বন্টনের পর ভাইদের মধ্যে সম্প্রীতি আরও বেশী করে বজায় থাকে। তবে তিনি পিতার সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার স্বীকার না করে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন।

বাঙালির সমাজজীবনে দুটি বড় সম্পর্ক হল ১) জ্ঞাতিত্ব এবং ২) কুটুম্বিতা। জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে ভূদেব বলেছেন ইহলৌকিক স্বার্থ সম্বন্ধই জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কের অবনতি ঘটায় আর সম্পত্তিই হল সেই স্বার্থ। তাই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই উচিত। একে জ্ঞাতিপালনে পরান্মুখতা বলা চলে না। তেমনই কুটুম্বতা সম্পর্কটিও বেশ জটিল। এই জটিলতার সমাধানের জন্য ভূদেবের সযৌক্তিক পরামর্শ এই যে কন্যা-সম্প্রদাতা এবং কন্যাগ্রহীতা দুই কুটুম্বকেই সমান চোখে দেখতে হবে, সমান মর্যাদা দিতে হবে। কুটুম্বরা কুটুম্বের গৌরব চান। তাই গৌরব বৃদ্ধিকারক কাজে সর্বদা কুটুম্বদের সঙ্গে পরামর্শ করে চললেই এ সম্পর্ক বজায় থাকে। ভূদেব এখানে কন্যাগ্রহীতার শ্রেষ্ঠত্বের পরম্পরাগত ধারণাকে সমর্থন করেননি আদৌ।

আচার প্রবন্ধ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নিত্যাচার প্রকরণ, আর এক ভাগে নৈমিত্তিক আচার প্রকরণ। নিত্যাচার প্রকরণে হিন্দু গৃহস্থের দৈনন্দিন করণীয় কর্মের তালিকা ও তার বিশ্লেষণ আর নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে কোনো হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য আচারবিধির কথাই আলোচিত হয়েছে। যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করণীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচীর কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে বর্জন করার কথা বলেননি ভূদেব। এখানে ভূদেব সময়োচিত পরিবর্তনের গুরুত্ব বুঝতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু নৈমিত্তিক আচার প্রকরণে হিন্দুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করণীয় অনুষ্ঠানের (যেগুলিকে আজ rites de passage বা life cycle rituals বলা হয়) যে ব্যাখ্যা ভূদেব করেছেন তা সত্যিই সুন্দর ও যুক্তিগ্রাহ্য। পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক হিন্দুর জীবনে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ নির্দেশিত পথেই চলেছে। এদেশের পরম্পরাগত সমাজ দৃষ্টির সম্পূর্ণতা এই সব অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। সমস্ত শুভকর্মের সূচনায় বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে পিতৃ-পুরুষের যে স্মরণ অনুষ্ঠান হয় তার আধ্যাত্মিক মূল্যকে গুরুত্ব না দিলেও এর যে একটি বিশেষ হার্দিক মূল্য আছে এবং, এটা যে পারিবারিক সংহতিকে দৃঢ় করে একথা অনস্বীকার্য।

সামাজিক প্রবন্ধ

পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ এবং **সামাজিক প্রবন্ধ—** এই তিনটি গ্রন্থের প্রধান কথা হল ভারতীয়দের বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মকে কী করে রক্ষা করা যায় ও সুদৃঢ় করা যায়। ধর্মের দুটি দিক ÷ একটি হল আধ্যাত্মিকতা (spirituality), আর একটি হল সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলা

(duties and code of conduct)। ভূদেবের মতে ধর্মই সামাজিক স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। দুর্বল ভারতসমাজেরও বলবৃদ্ধির একমাত্র উপায় ধর্মবৃদ্ধি। ধর্ম বলতে কর্মকেই বোঝায়। যে কর্ম দ্বারা (ক) সাক্ষাৎভাবে কিংবা পরম্পরাক্রমে পরার্থপরতা প্রবল হয়, (খ) সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, (গ) আত্মসংযম বর্ধিত হয় এবং (ঘ) পাশবভাবের হ্রাস হয় সেটাই ধর্মসম্মত কার্য। নিজেদের সমাজের মধ্যে সহানুভূতি বিস্তারে যা ব্যাঘাত ঘটায় ও মনের সংকীর্ণতার জন্ম দেয় এবং বিলাস বাসনাকে বাড়িয়ে দেয় তা কখনই ধর্মকার্য হতে পারে না।

ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সংহতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রটি ভূদেবের আলোচনায় সুপরিস্ফুট। তিনি ভারতসমাজের দুর্বলতার দুটি মূল কারণের কথা বলেছেন ÷ ১) বিদ্যাহীনতা ২) ধনহীনতা। ভূদেব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে ইংরেজ শাসনে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষার বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বাস্তবে কমে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজরা এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করে নি কারণ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হলে দেশে কলকারখানা বাড়ত এবং যুক্তিবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সত্যিকারের বিজ্ঞান-শিক্ষিত মানুষেরা দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত ও বিধির যুক্তি সম্মত আলোচনার ফলে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হত। আর্যশাস্ত্রে "ভৌতিক শক্তির প্রভাব এবং মনুষ্যের সাধন প্রচেষ্টার প্রভাব" স্বীকার করা হয়েছে। যদিও তিনি পুনরুজ্জীবনবাদের মত এক জায়গায় বলেছেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত বহু তথ্য আর্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি কখনই গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন না। বিজ্ঞানপ্রেমী ভূদেব পরিষ্কার বলেছেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করা এবং কলকারখানা স্থাপন করা ভারতবাসীদের ঐহিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য (১) বাইরে থেকে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ্‌কে আনা যেতে পারে অথবা (২) বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল শিখে আসার জন্য এদেশের লোককে বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। কালাপানি পার হওয়া সম্পর্কে রক্ষণশীলদের গোঁড়ামি ও আপত্তিকে ভূদেব আদৌ গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে এদেশে শিল্পবিদ্যাকে নিয়ে আসার জন্য বিদেশযাত্রা সমাজকে ভালবাসা এবং তা লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ প্রকৃত সৎকাজের বিরোধী নয়।

ধনহীনতার প্রতিকারের জন্য তিনটি উপায় হল ÷ ১) ব্যয় হ্রাস, ২) ক্ষতির নিবারণ, ৩) আয়ের বৃদ্ধিসাধন। আর ভূদেবের মতে এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে প্রয়োজন "১) বিলসিতার লাঘব, ২) অকার্যে অর্থব্যয় পরিহার, ৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, ৪) দেশীয় সালিশের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, ৫) যৌথ কারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।" এদেশের তথাকথিত অভিজাত ও শিক্ষিতবর্গের অন্ধ পরানুচিকীর্ষা যে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী এই সত্য ভূদেবের শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে স্পষ্ট এবং এটা তাঁর গভীর সমাজতাত্ত্বিক মননের পরিচয়। একই সঙ্গে এটা তাঁর গভীর স্বদেশচেতনার ও জাতীয়তাবোধের পরিচয়।

জাতীয়তাবোধ প্রবুদ্ধ ভূদেব তাঁর স্বদেশবাসীর জাতীয়ভাব বিকাশের জন্য যে ধাপগুলির কথা বলেছেন তার থেকে অন্যান্য সমাজের তুলনায় হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি ভারতবাসীর চিত্তের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন জাতীয়ভাবের উপলব্ধি। এর জন্য দরকার ১) নিজের প্রতি অনুরাগ, ২) নিজ পরিবারের পতি অনুরাগ, ৩) বন্ধু-বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, ৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, ৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই পাঁচটি ধাপ উত্তীর্ণ হলে স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এর উদাহরণ গ্রীক ও রোমীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু অগস্ত কঁৎ স্বজাতি থেকে খুব বেশী রকম আলাদা নয় এমন জাতির লোকদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্যের কথা বলেছেন, ৮) যীশু এব মহম্মদের মধ্যে মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেছেন, ৯) বৌদ্ধরা জীবনমাত্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেন, কিন্তু এই সীমাকেও ছাড়িয়ে ১০) সজীব

নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ তথা সেই প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী সত্তার প্রতি অনুরাগের কথা চিন্তা করেছে আর্যরা। ভূদেবের মতে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ তাদের সুমহান সংস্কৃতিতেই নিহিত। পরানুচিকীর্ষা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিকাশ সম্ভব নয়। আবার ভারীতয়দের এই ঐতিহ্যলালিত জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য কখনই পরজাতি বিদ্বেষ ও পরজাতি পীড়নকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আন্তর্জাতিক প্রীতি ও সখ্য ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

ভূদেবের উদার ও যুক্তিবাদী চিন্তায় হিন্দুদের সাথে মুসলমান ও খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের ভারতবাসীরাও ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিন্দুদের বিচ্ছেদপ্রবণতা ও স্বজাতিবিদ্বেষ মুসলমানদের মধ্যে নেই। মুসলমানদের ঐক্যানুভূতি শিক্ষনীয়। ভূদেব ইঙ্গিত করেছেন যে ইংরেজরা মুসলমানদের মধ্যে নেই। মুসলমানদের ঐক্যানুভূতি শিক্ষনীয়। ভূদেব ইঙ্গিত করেছেন যে ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু এবং মুসলমান একত্রিত হলে ভারতীয় সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সেই কারণেই তারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই এই বিভেদ নীতি এবং অনৈক্যের কুফল সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে জাতীয়ভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। এই স্বধর্মনিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুসলমান শাসকদের প্রতি ভারতবাসীর ঋণের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। মুসলমান শাসনে ভারতবর্ষ একটি সাধারণ হিন্দী ভাষা বা হিন্দুস্তানী ভাষা লাভ করেছে। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ করে হর্ম্মশিল্পে সৌন্দর্য্যের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং সাধারণভাবে সমাজ জীবনে সৌজন্য রীতির একটি প্রশংসনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তাঁর আর একটি গ্রন্থ **স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস**-এ ভূদেব লিখেছেন ভারতভূমি যদিও "হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি", যদিও হিন্দুরাই এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তথাপি "মুসলমানেরাও ভারতভূমির কাছে পর নহেন।" ভারতবর্ষ মুসলমানদেরও "আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানরাও ইহার পালিত সন্তান।" তিনি প্রশ্ন করেছেন "এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয় না?" তার উত্তর অবশ্যই হয় সকলের শাস্ত্রমতেই হয়।" তিনি কাতরভাবে দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব? অপর অর্থাৎ বৃটিশরাজ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে ও বাড়িয়ে দিয়ে এবং সেই বিরোধের সুযোগ নিয়ে ভারতবাসীকে শোষণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন করছিল। **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে ভূদেব ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সুচতুরভাবে। দাদাভাই নওরোজির 'ড্রেন থিওরি' (বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় সম্পদের ব্রিটেনে অভিগমন) ও রমেশ দত্তের ডিইনভাস্ট্রিয়ালাইজেসন (ভারতে শিল্পায়নের বিনাশ) তত্ত্বের সঙ্গে ভূদেবের তত্ত্বের ও বিশ্লেষণের গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। আরও উল্লেখ্য বিষয় এই এই যে ভূদেব রীতিমত প্রচুর তথ্য (data) সহযোগে ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয় সম্পদের লুণ্ঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। সেইসব তথ্য আবার কোম্পানীর দেওয়া সরকারী নথি থেকেই তুলে ধরেছিলেন তিনি। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহের সাথে সাথে তথ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভূদেবের প্রচেষ্টা এই দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূণ।

সার্থক সমাজবিশ্লেষণ সমস্যার মূলেরই সন্ধান দেয় না তার মূলোচ্ছেদেরও উপায় নির্দেশ করার চেষ্টা করে। ভূদেবও তাই ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে সেখানে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন ভারতবর্ষেও সেইরকমটি হতে চলেছে। তিনি আশা করেছেন হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হয়ে চলবে। ভূদেবের এই আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে ভূদেবের প্রত্যাশা সঙ্গতিপূর্ণ।

দেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের যোগাযোগের জন্য একটি জাতীয় ভাষা

ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত কীভাবে করা যায় সেটি ছিল ভূদেবের সমাজ বিশ্লেষণের একটি প্রধান লক্ষ্য। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দীভাষার চর্চা ও ঐ ভাষায় ভাবের ও সংবাদের আদানপ্রদান। ভূদেব লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে "হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক।" তাঁর অনুমান ছিল এই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে অবলম্বন করেই ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকবে। খণ্ডিত ভারতে তাঁর এই অনুমান সত্য হয়েছে।

বিহারের হিন্দীভাষার বিদ্যালয়গুলি তাঁর উৎসাহে সংখ্যায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আদালাত ও অফিস কাছারীতে ফারসীর বদলে হিন্দীর চল ও কায়েমী বর্ণলিপির ব্যবহার তাঁরই প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি শুধু বিনয়ই প্রকাশ করেননি অসাধারণ সমাজবোধ বা সমাজতাত্ত্বিক বোধেরও পরিচয় দিয়েছিলেন। সমাজ পরিবর্ত্তন কোনও ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় হয় না। "যে সকল শক্তিতে মনুষ্যসমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে সেই কালসহকারে এই (অর্থাৎ হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রচলনের) দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় আমি সেই দিকে চেষ্টা করিতে থাকি।"

বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন ও অস্পৃশ্যতার বিরোধ

জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় হিন্দী ভাষার অধিকতর প্রচলনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিকদের নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে প্রদেশ নির্বিশেষে বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন ভূদেব। অর্থাৎ ভূদেব বর্ণ ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি একই বর্ণের বিভিন্ন অবস্থার লোকেদের ভেদকে অথবা একই বর্ণের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের ভাষাগত বা প্রদেশগত পার্থক্যকে জাতিভেদের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেননি। কালক্রমে কোনও একটি বর্ণের মধ্যে এই ধরণের পার্থক্য লুপ্ত হবে এমনটি মনে করেছিলেন তিনি। ভূদেব সাম্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করেননি। সামাজিক বৈষম্যকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন বলে মনে করেছিলেন তিনি। হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্যকে তাই স্বাভাবিক বলেই মনে করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে বর্ণভেদ গুণগত ও সংস্কারগত, শুধুমাত্র বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, নয়। আর এই বর্ণ ব্যবস্থার ফলেই হিন্দুদের ক) স্বাতন্ত্র্য ও খ) আভিজাত্যবোধ এবং গ) অভিজাতদের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম বোধ-এর স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছিল। এই বর্ণব্যবস্থাই ভারতীয় হিন্দুদের সর্বগ্রাসী ও স্বাতন্ত্র্যবিনাশী পশ্চিমীভবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেছিল।

উদারমানা এই ব্রাহ্মণ বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমন কি, হিন্দুদের উপর সাম্যধর্মী মুসলমান শাসনকে এই পাপের ঈশ্বরপ্রেরিত প্রায়শ্চিত্ত বলেও বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই দেশে সর্ব প্রথম সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা ও অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছিলেন।

২. বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

৩. ইংরাজীতে শিক্ষিত গোষ্ঠীদের পরানুচিকীর্ষা এবং আপন সমাজ ও সংস্কৃতির বিদ্বেষমূলক সমালোচনার উত্তরে ভূদেব ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরম্পরার বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তিকে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন।

৪. ভূদেব **সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ** ও **আচার প্রবন্ধ**-এ হিন্দুদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখান এবং ভারতীয়দের জাতীয়ভাবের উপাদানগুলি পরীক্ষা করেন। হিন্দু সমাজের শক্তি ও দুর্বলতা, জীবনধারা ও মূল্যবোধ বোঝানোর জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনামূলক আলোচনার পথিকৃৎ ভূদেব।

৫. ভূদেব ভারতীয়দের বৈচিত্র্যে মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধান করে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জাতীয় ভাষা রূপে হিন্দু ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ভূদেব সামাজিক বৈষম্যকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। বর্ণ ব্যবস্থায় তাই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতাকে বর্ণ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য বলে কখনই বিবেচনা করেন নি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পা) **সামাজিক প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়**। কলিকাতা ১৯৮১

২। লাহিড়ী, শিপ্রা **ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য ;** কলিকাতা ১৯৭৬

৩। Raychaudhuri, Tapen **Europe Reconsidered : Perceptions of the west in Nineteenth Century Bengal;** Delhi 1988.

১২.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

উদ্দেশ্য

ক এককের এই খণ্ডটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

২.১ বিদ্যাসাগরের জীবনে কয়েকটি মুখ্য ঘটনা

২.২ বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রবাহের প্রধান তিনটি ধারা

২.৩ সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণ ও কর্মোদ্যোগ

২.৪ বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রধান চারটি ধারা

২.৫ বিদ্যাসাগর কীভাবে দেশাচারে স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান যথার্থভাবে প্রয়োগ করে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ করেও সেই তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা

২.৬.ক শিক্ষা সংস্কারের দ্বারা বাঙালির মননে আধুনিকতার উদ্বোধনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

২.৬.খ. শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস

২.৭ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যাসাগেরর প্রয়াস

২.৮ বিদ্যাসাগরের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও উদারমানবতাবাদ

প্রস্তাবনা :

ভারতীয় সমাজকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় রামমোহন রায়ের পরেই বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.১ বিদ্যাসাগরের জীবনের কয়েকটি মুখ্য ঘটনা

বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তীকালে নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহারেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদনগুলির বিস্ময়কর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আপন প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃপক্ষের সাথে মতান্তরের জন্য চাকুরী পরিত্যাগ করে লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে অসামান্য কুশলতার পরিচয় দেন। কিন্তু ব্যক্তিগত উন্নতির উদাহরণ হিসাবে নয়, আপন সমাজের যুক্তিবাদী কিন্তু সহৃদয় সমালোচনা ও আধুনিক কালের উপযোগী সমাজ সংস্কারের জন্যই চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর।

২.২ বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রবাহের প্রধান তিনটি ধারা

পরম্পরাগত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তার পরিবর্ত্তনের জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াস প্রধানতঃ

তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায়—(১) সমাজক্ষেত্র, (২) শিক্ষাক্ষেত্র এবং (৩) সাহিত্যক্ষেত্র।

সমাজক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ ও বাল্যবিবাহ রদের জন্য বিদ্যাসাগর আজীবন সংগ্রাম করেছেন নানাবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। পুস্তকরচনা ও প্রকাশ, সংস্কৃত কলেজে নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন ও প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থরচনার সূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন বিদ্যাসাগর। পরে সংস্কৃত ও বিদেশী গ্রন্থের ভাব অলম্বনে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন গ্রন্থ ও রচনা করেন বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে। এটি নিঃসন্দেহে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

২.৩ সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনা ও কর্মোদ্যোগ

বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রচেষ্টা। তিনি নিজেই বলেছেন, "বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।" একমাত্র পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা পত্রে তিনি এই মন্তব্য করেন। এজন্য তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তৈরী ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছিলেন ÷ "আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা পরের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক মনে করিব তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

তার এই ঘোষণায় একদিকে পরম্পরাশাসিত সমাজের স্থবিরত্বের মূল কারণ অর্থাৎ দেশাচারের দাসত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কারের জন্য এই দাসত্ব মোচনের গুরুত্ব ও সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এই সংকল্প রেনেসাঁস বা বিচারশীল ও সৃষ্টিশীল মানবতার নবজাগরণ সম্ভূত জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্যে প্রবুদ্ধ মানবহৃদয়ের প্রতিজ্ঞা। রেনেসাঁসের ফলেই জন্ম হল আধুনিক মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও জ্ঞান, প্রেম ও কর্মে গঠিত এই ইনটিগ্রেটেড পার্সনালিটি, বা সুসংহত ব্যক্তিত্ব, 'অখণ্ড মানবতা', 'অক্ষয় পৌরুষ' যা জীর্ণ পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে যুগোপযোগী এবং ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বিদ্যাসাগর এই অর্থে আধুনিক মানুষ। তাঁর মধ্যে আধুনিক মনন ও কর্মের এই শক্তি ছিল বলেই তিনি সমাজের বিধি ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। সমাজকে তিনি অকারণে বা মূঢ়ের মত আঘাত করতে যান নি। সমাজের প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে তাঁর গভীর বাস্তব জ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু তাঁর এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও ছিল যে সমাজ অনড়, স্থানু ব্যবস্থা মাত্র নয়, সমাজ চলমান। তার চলার পথে মাঝে মাঝে মূঢ়তা ও অন্ধতা জমে ওঠে, শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলতে চায়। প্রয়োজনমত সেগুলিকে সবলে দূর করে দিয়ে সমাজের চলার পথকে সুগম করে তোলা এবং সমজজীবনকে সুখ করে তোলাই সমাজধর্ম পালন। আর এইরকম সুচিন্তিত পথে সমাজ সংস্কারই প্রকৃত সমাজসেবা।

মানবীয় প্রয়াসে সমাজ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর এই বোধ তাঁর সময়ে এদেশে খুব বেশী লোকের ছিল না। একথা সত্যি যে সমাজের বিভিন্ন অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সনাতন সমাজের ধ্যান ধারণা ও বিধিব্যবস্থা নিয়ে ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কঠোর সমালোচনা কলকাতার ভদ্র সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। তবুও দেশের অধিকাংশ লোকই মনে করত যে

সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সংস্কারের পথে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই বাধা দূর করার জন্য তিনি চারধাপে বিন্যস্ত কর্মধারা গ্রহণ করেছিলেন।

২.৪ বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসের চারটি ধাপ

প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের মত বিদ্যাসাগরকে বুঝতে হয়েছে তখনকার সমাজের অবস্থা। তাঁকে মনে রাখতে হয়েছে সমাজের প্রভাবশালী অংশের কথা। তাঁকে খুঁজতে হয়েছে সেই ধরণের যুক্তির কর্মকৌশল ও প্রচার পদ্ধতি যার দ্বারা তাদেরকে সংস্কারমুখী করে তোলা হয়। কোনও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি সমাজকর্তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় তবে সংস্কারের জন্য আপামর জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা যাবে। এখন, সমাজপতি ও সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছেই সদ্‌যুক্তি তো প্রধান কথা নয়, তাদের কাছে যা শাস্ত্র আছে তা-ই ধর্ম, তা-ই যুক্তি। বিদ্যাসাগর তাই চরম নব্যপন্থীদের মত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করেন না। বরং গভীরভাবে শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করে শাস্ত্র থেকে দেশাচারের বিরুদ্ধে যুক্তি খোঁজেন এবং তার সংস্কারের সমর্থনে শাস্ত্রবচনের সন্ধান করেন তিনি। এই কারণেই বিদ্যাসাগর **বিধবা বিবাহের** প্রস্তাবের অবসানের জন্য বলেন, "বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।" বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ তাই শাস্ত্রবিচার ও পণ্ডিতদের অনুমোদন। দ্বিতীয়তঃ, প্রভাবশালী জমিদার, ধনী, মানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সেই শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের সমর্থন সংগ্রহ করে সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের জন্য আবেদনপত্র পেশ করা। তৃতীয়তঃ, সরকারকে আইন প্রণয়নে প্রভাবিত করা। চতুর্থতঃ, আইন বিধিবদ্ধ হলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নতুন বিধিকে কার্যকরী করে তা হিন্দু সমাজের দ্বারা সাধারণভাবে গ্রাহ্য করা। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনে এই শেষ কার্যে বিদ্যাসাগর পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিদ্যাসাগর জীবনীর তা শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

২.৫ দেশাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োগ ও তথ্যাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রধান বাধা ছিল—ধর্ম নয়, শাস্ত্র নয়, দেশাচার। বিদ্যাসাগর এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ ও আলোচনায় এক প্রখর সমাজতাত্ত্বিক বোধ (সোসিওলজিকাল আণ্ডারস্ট্যান্ডিং) এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক'-এ বিদ্যাসাগরের কাতর মন্তব্য "ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস ! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিস, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।" 'লোকাচারের দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খল' এর ধারণার সঙ্গে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুরক্যাঁর (emile durkheim এর) 'সামাজিক ঘটনা' (সোশ্যাল ফ্যাক্ট) সম্পর্কিত প্রত্যয়ের গভীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন কীভাবে লোকাচারের যুক্তিহীন অনুশীলন ও অভ্যাস সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য অনর্থের সূচনা করে। এই ক্ষেত্রে তাঁর ধারণার সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ডেনিস রং (Denis wrong) এর মাত্রাতিরিক্তভাবে সামাজিকীকৃত মানুষ (Oversocialised Conception of man) এর ধারণার বিস্ময়কর মিল দেখা যায়।

বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন ঐতিহ্যের নির্বিচার ও সার্বিক বিসর্জন প্রকৃত সমাজদৃষ্টির ও সমাজতাত্ত্বিক বোধের পরিচায়ক নয়। অবস্থাবিশেষে ও প্রয়োজনমত ঐতিহ্যের বিশেষ বিশেষ উপাদানকে সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন

ঐতিহ্যশাসিত সমাজের অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর বিধিব্যবস্থার যুক্তিসম্মত পরিবর্ত্তনের জন্য। শাস্ত্রকে মেনে চলে বলে যে ভারতীয় সমাজ দাবী করে সেই সমাজের যুক্তিহীন লোকাচারকে বদলানোর জন্য শাস্ত্রবচনের সাহায্য নেন বিদ্যাসাগর। তাই অমানবিক লোকাচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তির সন্ধানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর অশেষে ক্লেশ স্বীকার করে শাস্ত্রসাগর মন্থন করেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব, স্কন্দপুরাণ, প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি প্রভৃতি উৎস থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে দেশাচার বা শিষ্টাচার অথবা লোকাচার কখনও শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি বা প্রমাণ হতে পারে না। শাস্ত্র ও লোকাচারের মধ্যে বিরোধ ঘটলে শাস্ত্রকেই মানতে হবে।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েই এই মত প্রতিষ্ঠা করলেন যে কলিযুগে পরাশরসংহিতাই বিশেষভাবে মান্য এবং পরাশরসংহিতায় বিধবা বিবাহের অনুমোদন রয়েছে। যে পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও সততার সঙ্গে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন তা পণ্ডিতবর্গের মধ্যেও দুর্লভ। তিনি একই সঙ্গে সদ্‌যুক্তি ও তর্ক বুদ্ধির মিলনে এবং শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োগে প্রাক্তন সমাজচিন্তাকে যতটা সম্ভব যুগোচিত করে তুলতে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।

এই প্রচেষ্টা বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের মত বহুবিবাহ রোধের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে "যদৃচ্ছাক্রমে মত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।" বহুবিবাহ রচিত হওয়া উচিৎ কিনা পুস্তকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বল্লালী আমলে প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথার অপকর্ষের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেন তিনি।

শুধু তা-ই নয়, কুলীন প্রথা ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েছে এই দাবীর অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর বাস্তব সমাজজীবন থেকে বিপুল তথ্যের অবতারণা করলেন। শুধু হুগলী জেলা আর জনাই গ্রাম থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে বহুবিবাহ বিশারদ কুলীন ব্রাহ্মণদের নামধামশুদ্ধ তালিকা পেশ করলেন। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রয়োগবাদী (empirical) সমাজসমীক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি।

একইরকম ভাবে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিরূপ লোকমতের বিরোধিতা করে সমাজজীবন থেকে একাধিক বাস্তব দৃষ্টান্ত দাখিল করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে লোকাচার অপরিবর্ত্তনীয় নয় মোটেই, সমাজের যে কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে লোকাচারের পরিবর্ত্তন ঘটে চলে। যেমন, বিদ্যাসাগরের সময়ে বৈদ্যরা উপবীত ধারণা করত এবং তারা মৃতশৌচ পালন করত ১৫ দিন। কিন্তু তার আগে বৈদ্যদের উপবীত ধারণা করার বিধি বা লোকাচার ছিল না এবং লোকাচার অনুযায়ী তাদের অশৌচ কাল ছিল একমাস। বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন—যদি এসব ক্ষেত্রে লোকাচারের পরিবর্ত্তনে সমাজের আপত্তি না হয়ে থাকে তাহলে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সমাজ অনড় মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে কেন ? শুধু যুক্তিতর্ক নয়, কেবলমাত্র তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা নয়, সাথে সাথে সমাজজীবন থেকে বাস্তব দৃষ্টান্ত ও তথ্য প্রয়োগ করে বস্তুনিষ্ট, তথ্যভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত স্পষ্ট লক্ষণীয় বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণে।

একই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাল্যবিবাহের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর। মহাকাব্য ও পুরাণে কাহিনী এবং বিবাহ সম্পর্কিত শাস্ত্রোক্ত বিধি পর্যালোচনা করে তিনি এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, "পূর্বকালে প্রায় সবজাতি মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া (অর্থাৎ বিবাহকার্য) সম্পন্ন হইত।" উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববিশ্লেষণ, তথ্য সন্নিবেশ ও সমালোচনী দৃষ্টির যথার্থ প্রয়োগ নিঃসংশয়ে এদেশে সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল একথা বোধ হয় বলা যায়।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই বিশ্লেষণের ফলে প্রকটিত সামাজিক ত্রুটি ও সমস্যাকে অতিক্রম করা, সমাজকে যুক্তি ও সমাজহিতের নীতি অনুযায়ী বদলানো। এই বদলানোর জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। এখানেই তাঁর অজেয় পৌরুষের কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন ও বহুবিবাহ রোধ এই দুই ক্ষেত্রেই জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আইন প্রণয়নও চেয়েছিলেন তিনি। তার জন্য আবেদনপত্রগুলিতে কয়েক সহস্র লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বিরোধীরাও সমসংখ্যক বা আরও বেশী স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন করেছিল সরকারের কাছে বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে আইন যাতে না হয় তার জন্য। বহু অপবাদ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন যাতে পাশ হয় তার জন্য। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রচলিত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বহুবিবাহ রোধের জন্য সরকারী আইন প্রণয়ন শেষ পর্যন্ত হয় নি। শেষ পর্যন্ত ভারত স্বাধীন হবার পরে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হয়। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু বিদ্যাসাগর বিরোধীদের কথা সত্য হয় নি—বহুবিবাহের কুপ্রথা আপনা আপনি উঠে যায় নি। বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়ন হবার পর বাস্তবে এই বিবাহের যাতে চল হয়, সমাজ তার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ নেন তিনি। এর জন্য সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা পেলেও বিদ্যাসাগরকে নানারকম মানসিক অত্যাচার এমন কি শারীরিক পীড়নের ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিষয়ে নানাভাবে প্রতারিতও হয়েছিলেন তিনি। লোকভয়ে ও প্রতারণায় তিনি কিন্তু দমেন নি। নিজের ছেলের বিধবাবিবাহের প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি। পরিবর্তনের জন্য এই অসংকোচ ও নির্ভীক কর্মোদ্যোগ বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের, বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধের জন্য সকল প্রচেষ্টাতেই হৃদয়ধর্মে উদ্বুদ্ধ প্রাণধর্মে প্রবল মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাই আমরা। এইসব প্রয়াসের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি স্ত্রী জাতির অধিকারের সংগ্রাম। এই সংগ্রামও কিন্তু মানবাধিকার (রাইট্‌স্ অব ম্যান) অর্জনকল্পে আধুনিক মানুষের সংগ্রামের মুখ্য এক রূপ। তবে এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর বোধ হয় সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে বেশী করে পরিচালিত হয়েছিলেন তাঁর হৃদয়াবত্তার দ্বারা— অভিজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক আবেগের দ্বারা। তিনি শুধুই বুদ্ধিচালিত, যুক্তিচালিত মানবতাবাদী নন— যেমন প্রধানতঃ ছিলেন (যদিও পরমার্থ বিশ্বাসী) রামমোহন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিপীড়িত স্ত্রীজাতির বিবিধ অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, বঞ্চিত স্ত্রীজাতির আবেগঅনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা (empathy) স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই একাত্মতাই তাঁর সমাজসংস্কারের সংগ্রামের প্রেরণা। তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব নিয়ে, অজেয় পৌরুষকে হাতিয়ার করে এগিয়ে গিয়েছিলেন এই সমাজকে স্ত্রীজাতির বাসযোগ্য করে তোলার কাছে আধুনিক মানবতার অগ্রদূত বিদ্যাসাগর।

২.৬.ক. শিক্ষা সংস্কারে আধুনিকতার ভগীরথ বিদ্যাসাগর

স্ত্রী জাতির অবস্থার উন্নতির জন্য, সাধারণভাবে সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্ত্তনের জন্য আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ইউরোপীয় সভ্যতার আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এদেশের মানুষের মধ্যে না ছড়িয়ে দিতে পারলে রক্ষণশীলতার অচলায়তন ভাঙ্গা যাবে না বলে মনে করেছিলেন তিনি। বস্তুতঃ শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর সমস্ত সংস্কারকর্মের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সনাতনপন্থী সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন সাধন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েই তিনি কলেজের পরিচালন ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন আনলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পাঁজিকে অনুসরণ না করে ছাত্র সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক ছুটির সঠিক নিয়ম প্রবর্ত্তন, আগের মত শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্যই নয় উচ্চবর্গের সমস্ত হিন্দু শিক্ষার্থীর কলেজে প্রবেশাধিকার প্রদান প্রভৃতি তার উদাহরণ। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শিক্ষানীতির পরিবর্ত্ত।

তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃতের জ্ঞানভান্ডার ও ইংরাজী জ্ঞানসম্ভারের সম্মিলিত সম্পদে ঐ কলেজের ছাত্রদের সমৃদ্ধ করে তুলতে যাতে তাঁরা বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে চরমসীমায় যেতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। কোম্পানীর সদস্যের শিক্ষাপরিষদের কাছে এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন ÷

কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। .....বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই। .....সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।

বিদ্যাসাগরের মতে মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, **দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি** শিক্ষকদের এ গুণগুলি থাকা চাই। গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই ছাত্রদের ইংরাজী ও সংস্কৃতি দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে পড়তে হবে। দুই সূত্র থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তারা আপন বিচার বুদ্ধিকে যুক্তি বোধকে শানিত করতে পারবে। তাঁর এই শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্যও বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে যেখানে কিছুতেই তিনি নিজের কোনও নীতিকে বাস্তবে রূপদান করতে পারেন নি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সেখানে তিনি যুক্তিচালিত বিবেক ও কর্ত্তব্যবোধের তাড়নায় উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী এক কথায় ছেড়ে দিয়েছেন একাধিকবার।

বিদ্যাসাগরই সময়োপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম ব্যাখ্যাকার। তাঁর প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাণবস্তু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান। কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তির জন্য দরকার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি। তার বাহন হবে মূলতঃ জাতীয় (বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলা) ভাষা। জাতীয় ভাষার সম্যক উন্নয়ন করতে হবে যাতে তা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহন হয়ে উঠতে পারে। সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজী (ইংরেজিই তখন পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার) ভাষা ও সাহিত্য থেকে। আর দেশজ ভাষার সবল, স্বচ্ছ ও সাবলীল রচনারীতি আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃতের সহায়তা দরকার যদিও দেশজ ভাষা সবলতা অর্জন করলে সংস্কৃতের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। এই জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে এই ত্রিভাষা নীতিতে ইংরাজীতে দৌত্য অস্বীকার না করলেও ইংরাজী ভাষার দাসত্বকে স্বীকার করবে না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে হলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে হবে এই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যাসাগরের ছিল।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সুগম করার জন্য বিদ্যাসাগর নূতন প্রণালী বা কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। সেই কৌশল ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপক্রমনিকা রচনা করেছিলেন শিক্ষার্থীদের জন্য। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিবেচনা করে বাংলায় রচিত তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি একদিকে যেমন তাঁর বাস্তববোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক তেমনই অন্যদিকে তা পাঠ্য রচনা রীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতার পরিচয়বাহী। 'বর্ণপরিচয়' এ বর্ণজ্ঞান থেকে শিশু বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাতে ধরে নিয়ে যান। এভাবে বাংলাভাষার বর্ণবোধের শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বদ্ধ করা বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি। দ্বিতীয় ধাপে 'কথামালার নীতিমূলক গল্প, তৃতীয় ধাপে 'চরিতাবলী'-র দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের সফল শিক্ষোন্নত পুরুষদের জীবনী, আর পরবর্তী ধাপে 'বোধহয়'-এ ঐহিক পদার্থ সমূহের আবশ্যিক জ্ঞানের পরিবেশন বিদ্যাসাগরের সুশৃঙ্খল শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। শেষ পর্যন্ত উৎসুক শিক্ষার্থীকে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি সাহিত্যকৃতির চিরন্তন রসসম্পদের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন তিনি। আধুনিক সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে ঐহিক জীবনের কথাই

মুখ্য বিদ্যাসাগরের এ গ্রন্থগুলিতে। আধুনিক জীবন ; পৃথিবীর জ্ঞান ; বৈজ্ঞানিকদের জীবন সংগ্রাম ; অখ্যাত দরিদ্র মানুষদের শিক্ষা, পরিশ্রম ও স্বকীয় উদ্যোগের সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ, ব্যক্তির জয়গানের সঙ্গে বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের উদ্বোধন, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণনীতির বোধ জন্মানো এই সবই ছিল এই সব গ্রন্থের মূল কথা এবং বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির ভিত্তি। আজও এই ভিত্তি অপরিত্যাজ্য। অবশ্যই একালের দৃষ্টি অনুযায়ী রঙে রসে ছবিতে ছড়ায় সঞ্জীবিত করে এই বাস্তব শিক্ষাকে মনোরঞ্জন করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

২.৬.খ. শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস

বালিকা বিদ্যালয় আয়োজনের মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নতির ভিত্তিস্থাপন তথা বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে জনশিক্ষার আয়োজন বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত বাংলা শিক্ষা যাতে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিতের সাথে সাথে আধুনিক গণিত, পদার্থবিজ্ঞা, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি শেখারও ব্যবস্থা থাকবে ঐহিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভের উপায় হিসাবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকলীন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টার অব কলেজের দায়িত্ব পেয়ে অতি অল্প সময়েই ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০টি মডেল স্কুল স্থাপনার ব্যবস্থা করেন তিনি। অবশ্য, পরবর্ত্তীকালের ব্রিটিশ আমলাদের ও এদেশীয় অভিজাতবর্গের উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বেথুন কলেজের সম্পাদক রূপে কলেজের জন্য নিয়মিত ছাত্রীসংগ্রহে ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার ব্যবস্থা করায় এবং মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজকে গড়ে তোলায় বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াস চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। নারীর উন্নতি বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনর শেষ পর্যায়েও (১৮৯০) তিনি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপন করেন, 'ভগবতী বিদ্যালয়' আর কার্মাটারে চালাতেন পাঠশালা। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। মেট্রোপিলটান কলেজই বাঙালী পালিত প্রথম বেসরকারী কলেজ যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের পরিচালন-নৈপুণ্যে ও আন্তরিক নিষ্ঠায়। বিদ্যাসাগর অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বুঝতে পেরেছিলেন এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য হয়ে উঠছিল লেখাপড়া শিখে গাড়িঘোড়া চড়া, ভারতীয় সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকিত করে আধুনিক পৃথিবীতে জীবন্ত গতিবেগ সম্পন্ন সমাজ রূপে গড়ে তোলা নয়— এমনকি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীর অবনত সামাজিক স্থিতির উন্নতিসাধনও নয়। কিন্তু তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে ভারতীয় সমাজকে জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার অগ্রসর হতে হবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে করায়ত্ব করতে হবে। এবং বহু ব্যর্থতাবোধ সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টায় আজীবন ব্রতী ছিলেন বিদ্যাসাগর।

২.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান

সাহিত্য সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তবু তিনি জানতেন প্রাঞ্জল, মার্জিত বাংলা না হলে পাঠ্যপুস্তকও নীরস ও অপাঠ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষনীয় বিষয়কে বিশুদ্ধ মার্জিত এবং সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। পুস্তক রচনায় সেটাই হল মুখ্য শিল্প। আর এ শিল্পের উৎকর্ষ আমরা প্রথম দেখি বিদ্যাসাগরের মধ্যে। এদিক থেকে তিনি যুগান্তকারী সংস্কারক।

বিদ্যাসাগরের রচনার দ্বিতীয় বিভাগ সমাজ সংস্কারমূলক রচনা। তার দুটি ভাগ— প্রচারমূলক বিচার প্রধান লেখা এবং বেনামীতে প্রচার ভিত্তিক লেখা। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী যেগুলি প্রথমোক্ত শ্রেণীতে পড়ে সেগুলিও সফল হয়েছে কারণ তাঁর এইসব বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাও নীরস নয়। বরং যুক্তির দীপ্তি, চিন্তার সর্বব্যাপী শৃঙ্খলাবোধ, রুচির ও ভাষার মার্জিত সংযম এবং উদ্দেশ্যের গাম্ভীর্যে (seriousness) এগুলি সমুজ্জ্বল। উপরন্তু আবেগের স্পর্শ

লাগাতে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য লেখাও যে কত অমোঘ ও হৃদয়স্পর্শী হতে পারে তা তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক-এ সুস্পষ্ট। আবার প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কৌতুকব্যঙ্গে মুখর উল্লাসিত বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলির ভাষাও সরস, সতেজ চলিত ভাষার আদি সংস্করণ। তাঁর এই রচনাগুলি ও রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তাঁর প্রবন্ধগুলি যেমন 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ, চিন্তার স্বচ্ছতায়, বুদ্ধির ও বিদ্যার সুস্থিত আয়োজনে এবং ভাষার মার্জিত শ্রীতে উপভোগ্য এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞানপগুলি বৈজ্ঞানিক সমালোচনা দৃষ্টির সুদৃষ্টান্ত।

আর সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি বাল্মীকি ও কালিদাস ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সেক্সপীয়র-এর রচনার ছায়া অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকর্মগুলি যথা, 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তি বিলাস' সাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের যুগোপযোগী রসবোধের সুষমামণ্ডিত উদাহরণ।

শিক্ষাপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর আশানুরূপ সাফল্য পান নি অথচ এখনও তাঁর শিক্ষানীতি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমাজ সংস্কারে তাঁর সাফল্য আরও কম। কিন্তু যে সাহিত্য কর্মে বিদ্যাসাগর বিশেষ আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি আজকে বিচারে সেখানেই তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত এবং শাশ্বত। রবীন্দ্রনাথ তাই বোধ হয় বলেছেন, "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।"

২.৮ ধর্ম নিরপেক্ষ উদার মানবতাবাদের প্রতিভূ বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসগারের অপরিসীম মানবদরদের বহু কাহিনী প্রচলিত। তাদের অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বেছে নিলেও সেগুলির মধ্যে সর্বমানবের প্রতি তাঁর সত্যিকারের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ১৮৬৭ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষদের সাহায্যের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে লঙ্গরখানা খোলেন বিদ্যাসাগর। এইখানে বিভিন্ন জাতপাতের মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত আশ্রিতদের ব্যক্তিগত সেবায় তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। দুই, ১৮৬৮ সালে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য বর্ধমানে যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। তাঁর বাসার কাছেই ছিল মুসলিমদের একটি বস্তি। প্রথমে বস্তির শিশুদের সঙ্গে, পরে তাদের বাবাদের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের। তিনি ভালরকম অর্থ সাহায্য করেন দরিদ্র মুসলিম বস্তিবাসীদের। পরের বছরেই যখনই ওই বস্তিতে কলেরা দেখা দেয় তখন মুসলিম শিশুদের অকুণ্ঠচিত্তে কোলে তুলে নেন বিদ্যাসাগর। তাঁর যজ্ঞোপবীত অপবিত্র হয়ে যায়নি তাতে। শেষতঃ, জীবন সায়াহ্নে তিনি কার্মাটারে কালযাপন করেন আদিবাসী সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। এদেশের জনসমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীসমূহের একাংশের এই মানুষগুলিকে আন্তরিকভাবে আপন করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাদের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রদানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের জন্য কার্মাটারে বিদ্যালয় স্থাপন। বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নৃজাতির সমন্বয়ে গঠিত যে ভারতীয় সমাজ তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃতি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই এই সমাজের যোগ্য সদস্য হবার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ হিসেবে জাতপাত, ধর্ম সম্প্রদায় ও নৃজাতি (ethnic group) সংক্রান্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের এই সমাজবীক্ষা ও জীবনচর্যা ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘোষ, বিনয় **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**। কলিকাতা ১৯৭০

২। Poddar, Arabinda **Renaissance in Bengal : Quests & Confrontations** simla 1970

৩। বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র **বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ** (১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড) কলিকাতা ÷ সাক্ষরতা প্রকাশন ÷ ১৯৭২

একক ১৩ ❒ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

গঠন

১৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩.২ স্বামী বিবেকানন্দ

১৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলতঃ সাহিত্যিক রূপেই বাঙালির কাছে পরিচিত। তিনি বাংলার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন। সাথে সাথে তাঁর বিবেচনায় হিন্দু ঐতিহ্যের যা শ্রেষ্ঠ অংশ, তার উপরে ভিত্তি করে দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আপন সমাজের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে ও সমসাময়িক দেশ ও কালে স্বদেশবাসীর ও ব্রিটিশ শাসকদের আচরণের যুক্তিশাণিত ও বিদ্রুপাত্মক সমালোচনায়ও তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এদেশে সমাজতত্ত্বের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছিল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব যা পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজ ও সমাজতত্ত্বকে চিহ্নিত করেছে তা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল।

উদ্দেশ্য : এই এককটিতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পর্যালোচনার জন্য আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক পরিবেশ ও তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। ইংরাজী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর সুবাদে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তাঁর পরিবার খাতির পেয়েছিল। বঙ্কিমের পিতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন যদিও বেশ পরিণত বয়সে। তাঁর সরকারী চাকুরীতে বদলির কারণে বঙ্কিমের শিক্ষায়তনের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর শিক্ষাজীবনে ইংরাজী শিক্ষারই প্রাধান্য ছিল যদিও তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠ নেন। প্রথমে হুগলী কলেজ ও পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মেধাবী ছাত্র বঙ্কিম একাধিক বৃত্তিলাভ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের দলে তিনি ছিলেন। পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ নানা ধরণের বিষয় ছিল। পরের বছর ঐসব বিষয় নিয়েই কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রথম দুইজন স্নাতকের একজন হন বঙ্কিমচন্দ্র। পরে তিনি আইনের পড়া চালিয়ে যান। পড়তে পড়তেই তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পাওয়ায় তাঁর কলেজজীবনে ছেদ পড়ে।

দীর্ঘ ৩৩ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করলেও বঙ্কিচমন্দ্র তাঁর সরকারী চাকরিতে শ্লাঘা অনুভব করেননি। সরকারি চাকুরে হিসাবে চাকরি বজায় রাখা এবং তার জন্য আমলাদের বিরাগভাজন না হওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দিক ছিল এবং সেটা তাঁর বিরক্তির একটা প্রধান কারণও ছিল। 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে সরকারের বিরূপতা দূর করার জন্য তাঁকে রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছিল। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে

যেখনে ইংরেজ শত্রুর কথা ছিল পরবর্ত্তী সংস্করণে সেখানে 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন এলিট গোষ্ঠীর অন্য অনেকের মতই বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব হয় নি এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে কিছু লেখার বা তার সমালোচনা করার। বাংলা গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে উন্নীত হওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যেই সে পদের বিলোপের ফলে তিনি যখন ফের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল হন তখনও তিনি মুখ বুঁজে সে ব্যবস্থা মেনে নেন। আবার অযাচিতভাবে তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হলে তা তিনি প্রত্যাখ্যানও করেন নি। বোধ হয় সেখানেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ট্র্যাজেডি এবং এই বিষাদ বোধ তাঁর পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়নে প্রভাব ফেলেছিল।

এই ট্র্যাজেডি বঙ্কিমের একার ছিলনা। ১৮৫০ সাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের আনুকূল্যের ভাঁটা পড়ে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের গভীর সন্দেহ ও বিরূপতার সৃষ্টি হয়। নানা রকম নূতন নূতন করের চাপ, খাদ্য শস্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, তুলার মূল্য হ্রাসের ফলে তুলাচাষীদের সর্বনাশা পরিস্থিতি এবং উপর্যুপরি আকালের ফলে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা বিদ্রোহও করে। আর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদ থেকে মধ্যবত্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন গণআন্দোলন বা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে পরিণত হয়নি। সরকারকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাথে সঙ্গত ও যুক্তিসহ আপোষে বাধ্য করা ছিল এর উদ্দেশ্য। অবশ্য, এই আন্দোলন স্বাজাত্যবোধ, ঐক্যবোধ, জাতীয়দম্ভ ও শ্রেষ্ঠতাবোধ এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-এর সূচনা করে। কিন্তু পরাধীনতার করুণ কঠোর বাস্তব এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও স্বাজাত্যবোধকে পদে পদে আহত করেছিল। তারই সঙ্গে ইউরোপীয় জীবনধারার অনুচিকীর্ষা একশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বাঙালীকে এ দেশের ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। আর ব্রিটিশের রচিত এদেশের ইতিহাসই পড়ত এদেশের লোক। ইতিহাসে পশ্চিমী সভ্যতার গুণকীর্তন ও এদেশের ঐতিহ্যের অবমাননাই ছিল সেই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য। এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজবীক্ষা গড়ে উঠেছিল।

কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে বঙ্কিম নিজের অধ্যাবসায়ে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন। যৌবনে লব্ধ জ্ঞানকে তিনি সারাজীবন ধরেই সমৃদ্ধতর করেছিলেন। সাহিত্যে সেক্সপীয়ার, বায়রন, এবং সাদি, টমসন এবং ক্যাম্বেল তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে সাহিত্যসভায় দান্তে, গ্যেটে, যুগো এবং বালজাক কে নিয়ে তর্কযুদ্ধ হত। তিনি ফরাসীভাষা জানতেন এবং লাতিন ও আরবী ভাষাও শিখেছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের যে অংশটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তা হল হিউম, বেন্থাম, জেমস মিল, অগস্ত কোঁৎ ও জন স্টুয়ার্ট মিল এর দার্শনিক চিন্তাভাবনা। ইউটিলিটা রিয়ানিজম্ বা উপযোগবাদ এবং কোঁৎ-এর পজিটিভিজম্ বা প্রত্যক্ষবাদ এবং মানবতাবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্কিমের ইতিহাস চর্চার প্রধান সহায়ক ছিলেন বাক্ল এবং লেকি। মেকলের গর্বোদ্ধত ইতিহাস আলোচনার সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কথা তাঁর লেখায় বারবার এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তায় তাঁর যুগেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এ মানসিকতার প্রধন উদ্গাতা ছিলেন বেকন ও জর্জ কুম্বের ভক্ত অক্ষয় দত্ত। ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি বঙ্কিমের আগ্রহ ছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সাধারণের জন্য লেখা এগারোটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান ঘেঁষা দার্শনিক প্রবন্ধগুলির জন্য তিনি ডারউইন, হাক্সলি, টিণ্ডার, লাকিয়ার

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্কিমের নাস্তিকবাদের পিছনে পশ্চিম থেকে আগত বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা অন্যতম সম্ভাব্য কারণ ছিল। পরে তিনি আস্তিক হন, তবে সারাজীবনই তিনি যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তিবুদ্ধি জিজ্ঞাসার তিনটি পর্ব :

নানা অসুবিধার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী জীবনে এবং সাহিত্য কর্মে স্বাধীন মানসিকতার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। যতই আকর্ষক হোক না কেন, যাচাই না করে কোনও মত বা আদর্শ গ্রহণ করতে তিনি রাজী হননি কখনও। তাই যুক্তিদী অন্বষার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দার্শনিক মতবাদ আয়ত্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। নিজের সৃষ্ট মত বা ধারণা ছাড়া কোন কিছুই নির্বিচার গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না তিনি। একদিকে তাঁর জিজ্ঞাসার স্বাধীনতা থেকেই বিনা বিচারে মহামহোপাধ্যায়দের অভিমতরে নিকট নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিতে চাননি তিনি। অন্য দিকে যেসব পাশ্চাত্য দার্শনিকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাদের মতবাদও তিনি সমালোচকের দৃষ্টি থেকে দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তবুদ্ধির এই উন্নত মস্তক প্রতিজ্ঞাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধি, পঠন ও অভিজ্ঞতায় পরিশীনিত চিন্তার জড়ত্ব ছিল না সেই চিন্তা ছিল সজীব ও পরিবর্ত্তনশীল। বঙ্কিমমানসের গতিশীলতায় তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে আমরা তাঁর অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দবেগের পরিচয় পাই। দ্বিতীয় পর্বে এর সাথে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা সংযোজিত হয় এবং এই পর্বেরই শেষ দিকে বঙ্কিমমানসের দুটি স্বতন্ত্র ধারার অর্থাৎ মনের অতীত আকর্ষণ এবং চোখে সম্মুখ দষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়। ফলে তৃতীয় পর্বে প্রাণপ্রাচুর্য এবং আনন্দবেগ এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির সঙ্গে তাঁর নব আবিষ্কৃত সমন্বয়ের প্রচার সংযুক্ত হয়। এর ফলে তাঁর চিন্তাধারায় অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যও দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের গুরুত্ব

নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় বৈজ্ঞানিক মনোভাব আগাগাড়োই উপস্থিত। 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় বিবৃত উনিস শতকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিন্তার বিষয়গুলি যা 'বিজ্ঞানরহস্য'-কে সঙ্কলিত হয় তা বঙ্কিমের বিজ্ঞানমনস্কতার উজ্জ্বল উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় আত্মসন্তুষ্টির স্থান ছিল না। তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রমাণের উপর। এমন কি ঋষিবাক্যকেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ না থাকলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আধুনিক মানুষের চাইতে ঋষিরা চিন্তায় অধিকতর দক্ষ একথা বঙ্কিমচন্দ্র মানতে অস্বীকার করেছিলেন প্রবলভাবে। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন আমি যাহা তোমার কাছে প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য।" নির্বিচারে কোনও কিছুকেই গ্রহণ করা প্রবল ভ্রান্তি। সংশয় থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আর বঙ্কিমের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ যুক্তিবাদী মনের সংশয় ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের সমাজতাত্ত্বির প্রেক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজতত্ত্ব চর্চা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ-এর মতামতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তিনি "বঙ্গদর্শনের জন্য **সমাজতত্ত্ব**" লিখতে বসার কথা বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলাদাভাবে কিছু লেখেননি। অবশ্য বাংলার ইতিহাস বা বাঙালি সমাজের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশনে বঙ্কিমচন্দ্র ‘‘On the Origin of Hindu Festivals’’ এবং A Popular Literature for Bengal’’ নামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের কার্য বিবরণীতে ঐ দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ১৮৬৯ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে তিনি উৎসবগুলির শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেন ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে উৎসায়িত কোনও উৎসব তিনি হিন্দুদের মধ্যে দেখতে পাননি। হিন্দুদের চিন্তা জগতে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের অভাবই এর কারণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বাঙালির জনজীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এক যুক্তিবহ বিশ্লেষণ। যেহেতু “দেশের জনসাধারণ ইংরেজি ভাষাবোধে একেবারেই বধির” ইংরেজি ভাষায় মত বা আদর্শ প্রচার করলে “জাতিব্যাপী বিরাট কাজের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর” হবে না। কোনও বড় ভাবের কথা বাংলা ভাষায় বাঙালিদের বোঝাতে পারলে সে ভাব তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং বিরাট ভাবের ঢেউ তুলতে পারবে। এই কারণেই সামাজিক দিক থেকে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক। “সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।”

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও তার পরিবর্ত্তনের যোগের এই বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সাহিত্যকৃতিতেই বর্ত্তমান। তাঁর মতে “সাহিত্যও নিয়মের ফল।... সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম বিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।” বঙ্কিমের এই অভিনব ও বিস্ময়কর উপলব্ধির মধ্যে একটি বিষয়গত সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বহু চরিত্রের দ্বান্দ্বিক ও প্রতিবাদী সত্তায় তাঁর যুগের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা প্রকটিত। যেমন ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে আয়েষা যখন জগৎ সিংহকে প্রাণেশ্বর বলে ঘোষণা করে, ‘বিষবৃক্ষ’তে সূর্যমূখীর প্রতিবাদী সত্তা যখন কুন্দ-নগেন্দ্রনাথের বিয়ের পর গৃহত্যাগী হয়, ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে চিঠিতে জানায় যে যতদিন সে গোবিন্দলালের প্রতি ভক্তির যোগ্য ততদিন তারও (অর্থাৎ ভ্রমরেরও) ভক্তি, ইত্যাদি, তখন এই চরিত্রগুলি প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক তথা সাবেকী পারিবারিক সম্পর্ক অতিক্রম করে, এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁস-উত্তর নারীদের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা মাঝে মাঝে আপ্তবাক্য পাই। যেমন ‘কপালকুণ্ডলায় পাই ‘পরের কাষ্টাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?” এইসব বাক্যে মানুষের জীবনের অপার রহস্যের ইঙ্গিত থাকে, কখনও কখনও সমাজরহস্যের দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিকও বটে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশ ১৮৭২ সালে। বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের ফলে “বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল”। রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাবাক্য থেকেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের গুরুত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এ পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য বলেছিলেন যে সুশিক্ষিত বাঙালি বাংলা রচনার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে বাঙালির উন্নতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন সেকালের শিক্ষাব্যবস্থায় জনসাধারণের কোনও গুরুত্ব ছিল না। ‘ফিলটার ডাউন’ (অর্থাৎ অল্পসংখ্যক উচ্চবর্গকে শিক্ষিত করলেই তাদের স্তর থেকে শিক্ষার ধারা চুঁইয়ে নীচে পড়ে নিম্নবর্গকেও শিক্ষিত করবে) পদ্ধতির শিক্ষাব্যস্থাকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। সভ্যতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিস্তারের জন্য শিক্ষিত বাঙালিকে বাঙালির জন্য বাংলা, ভাষায় লিখতে হবে। ‘বঙ্গদর্শন’ সেই কাজটা শুরু করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও ব্যঙ্গাত্মক রসরচনা ও প্রবন্ধের সাথে সাথে

সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য লেখকের সুখপাঠ্য ও যুক্তিবহ, রচনা ও সমালোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাস, প্র-তত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান বিষয়ে নানা রচনা 'বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক সম্পাদনায় সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধের উৎকর্ষের একটা মান নির্ণীত ও প্রতিষ্ঠিত হল 'বঙ্গদর্শন' এর মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর বাংলা রচনার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। Bengal social Science Association এর জন্য ইংরেজীতে প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি Mookerjee's Magazine এ "The confessions of a young Bengal" (1872) and "The study of Hindu Philosophy" (1873) লেখেন। Rajmohan's Wife শীর্ষক উপন্যাস ছাড়াও Hastie র সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় তাঁর তর্কযুক্ত ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে তাঁর কুশলতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু তাঁর সমাজবীক্ষায় তিনি বুঝেছিলেন কোনও জাতির বা জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উন্নতির জন্য তার ভাষার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। সমবেতভাবে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা ভাষাকে সবধরণের ভাবপ্রকাশের ও সর্বাধিক আলোচনার উপযুক্ত বাহন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের এই সূত্রটি সাহিত্যিক, সমালোচক ও সম্পাদক বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল বলেই বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক যুগের আশা, আকাঙ্খা ও সমস্যাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিল।

ইতিহাস চর্চায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

জীবনের প্রথম দিকের রচনা Confessions of a young Bengali-তে বঙ্কিম নিজেকে ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত তরুণের পাশ্চাত্যের সবকিছুর প্রশংসা এবং হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র বিরূপতার জন্য নাম কিনেছিলেন। যৌবনে এবং মধ্য বয়সের শুরুতে বঙ্কিমের মানসিকতা অনেকটা এই ধরণেরই ছিল এবং তাঁর রচনাবলীতে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লিষ্ট অন্যান্য ভারতবাসীর মত তিনিও তাঁর প্রাথমিক মনোভাব বজায় রাখতে পারেননি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপের থেকে উৎকর্ষ না হোক অন্তত সমতা বোধ করার মানসিক প্রয়োজনের কথা বঙ্কিম খোলাখুলি বলেছিলেন। আর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই বাঙালির দ্বারা বাংলার ইতিহাস, ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর গুরুত্বের কথা বলেছিলেন তিনি। জাতিকে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে গেলে ইতিহাস অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী। ইতিহাস চর্চ্চা আমাদের আত্মস্থ হতে সাহায্য করে। অতীতের গৌরব আমাদের উৎসাহিত করে। পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় পরাধীন জাতির ঐতিহ্যের নিম্নমান সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল পশ্চিমী পণ্ডিতের সৃষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ব বা Orientalism। ভারতে জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্থপতি বঙ্কিম তাই এই প্রাচ্যতত্ত্বের বৈধতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিশ্লেষণ আত্মাভিমানপ্রসূত এবং সেই কারণে নিরপেক্ষ নয় বলে বঙ্কিম সমালোচনা করেছেন। "মেকলে ক্লাইভের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন" বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য তাঁর মতে সত্যের অপভ্রংশ। মার্সম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিক ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ইউরোপীয়দের প্রাচ্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য অংশটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ব থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বই অভ্রান্ত নয়। এই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেকগুলি অন্তরায় ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল।

প্রথমতঃ তাঁরা যে ভারতীয়দের থেকে ভাল সংস্কৃত শিখেছেন, এই ধারণাটাই ভুল। তাঁর মতে, প্রত্যেক ভাষাই গড়ে উঠেছে একটি দেশের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে। এই কারণেই যে কোনও বিদেশী বিদগ্ধ পণ্ডিতের তুলনায় একজন সাধারণ দেশবাসীরও স্বদশীয় ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে এক ধরণের সহজাত সুবিধা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু দর্শন সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ বা একাত্মতাবোধ, কোনটিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ছিলনা। এর ফলে মাক্স মুয়েলারের মত পণ্ডিতও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

ভারত ও ইউরোপের তুলনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং অর্ধশিক্ষিত পাদ্রীরা একই মানদন্ড ব্যবহার করেননি বলে বঙ্কিম অভিযোগ করেছেন। দুই ভূখণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তারা দুই ভিন্ন মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। তার ফলে তাঁরা ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত তথ্যগত এবং তত্ত্বগত ভুলের জন্ম দিয়েছেন। বহু ঈশ্বরবাদ নাকি হিন্দুধর্মের দুর্বলতা। অথচ খ্রীষ্টানদের দেবদূত, সাধুসন্ত এবং শয়তানে বিশ্বাসের থেকে বহু দেবদেবীতে এই বিশ্বাস আলাদাও নয়, বেশী অযৌক্তিক নয়। এই সত্যটা পশ্চিমীদের চোখে ধরা পড়ল না কেন ? তেমনই ইন্দ্র ও অহল্যার উপখ্যানকে রূপক হিসাবে বিবেচনা না করে এই ধরণের কাহিনীকে প্রাচীন হিন্দুদের ব্যভিচারের উদাহরণ হিসাবে পেশ করেন পশ্চিমের লোকেরা। কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতিতে প্রচলিত এই ধরণের কাহিনীকে (যেমন গ্রীক পুরাণের ক্রিয়াকলাপ) রূপক হিসেবেই বিবেচনা করেন একই পণ্ডিতবর্গ। সতীদাহ প্রথার প্রতি সমর্থন দুর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিতদের নৃশংসতা বলে সমালোচনা করেছেন মাক্স মুয়েলার। তিনি তলিয়ে দেখেননি এর পেছনে ব্রাহ্মণ্যবাদের শাস্ত্রীয় সমর্থন কতটা ছিল অথচ খ্রীষ্টানদের ইনকুউজিশন এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কিত গণহত্যায় যে নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছিল তার সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন "একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াও ভারতবাসীদিগের একটি কথাও বুঝিল না।" অজ্ঞ ইউরোপীয়দের লেখা ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রহসনে ব্যক্ত হয়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' একটি চমৎকার উদাহরণ। নিস্পৃহ আত্মসমালোচনা এবং বিজিত জাতির সংস্কৃতির মূল্যায়নে ন্যূনতম বিচার বোধের অভাব সাম্রাজ্য বিস্তারী পশ্চিমী সভ্যতার একটি নৈতিক দুর্বলতা। পশ্চিমের মহত্তম ব্যক্তিত্ব ও পরাজিত জাতির ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতে ছাড়েন না। পশ্চিমীদের লেখা কোনো প্রাচ্যদেশের ইতিহাস তাই একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য প্রাচ্যবাসীদেরই তাদের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হতে হবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যথার্থ ইতিহাস বলতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও একই কথা বলেছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক উপাদানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারাই যথার্থ ইতিহাস রচনা সম্ভব। উৎপাদন সম্পর্কের সাথে অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস বিশ্লেষণ বা ইতিহাস পর্যালোচনার অন্যান্য আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি অবশ্যই বঙ্কিমের কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু কোনও জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যুক্তিশীল মন নিয়ে তাদের নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতির ও অর্থনীতির ইতিহাস লেখার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন। আর এই ইতিহাস রচনা যাতে খণ্ডিত না হয় তার জন্য সকলকে নিয়ে ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছিলেন — "আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক। ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকলকে নিয়ে চলার সূচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ।

তুলনামূলক বিচারে ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা

আত্মমর্যাদা বজায় রাখার জন্য কোনও কোনও বিষয়ে ভারতীয়দের ইউরোপীয়দের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত। অবশ্য যুক্তিবাদী মূল্যায়নের দ্বারাই এই গৌরববোধ গড়ে তুলতে হবে। সনাতন ধর্মশাসিত ভারতীয় বা হিন্দু সমাজের পরম্পরাক্রমে আগত সব কিছুই ভালো বলে দেখানোর চেষ্টা মূর্খতা। "অপবিত্র কুলুষিত দেশাচার বা লোকাচার ছদ্মবশে হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।" এগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। সুসংস্কারগ্রস্ত আচার-আচরণ সম্বলিত ধর্মমত পাশ্চাত্য শিক্ষায় লালিত ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের প্রয়োজন উন্নত মনের ধর্ম। প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামী দয়ানন্দের প্রচেষ্টাকেও স্বাগত জানাননি বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দু ধর্মের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন কতকগুলি শাশ্বত সত্য আছে যেগুলির উপর আলোকপাত করলে হিন্দুধর্মের সংস্কার, পুনরুন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব। হিন্দু ধর্মের এই অমলিন রূপটি তুলে ধরার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, অলৌকিক তত্ত্ব, খ্রিষ্টিয় আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস পাঠকে কাজে লাগিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিধৃত ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ধর্মের লৌকিক দিকটি অবশ্য কখনই উপেক্ষা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র।

হেষ্টির মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ছদ্মনামে এবং পরে লেখকের স্বাক্ষরে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একদা নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থার প্রথম প্রকাশ। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেছেন তিনি এই তর্কযুদ্ধে। কোনও ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন যে ধর্মে তার আস্থা নেই, সেই ধর্মের যথার্থ্য তিনি বিচার করতে পারেন কি না, বঙ্কিম সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

Letters on Hindusm প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন "সর্ব্বাপেক্ষা ব্যপ্তি এবং উচিৎ অর্থে ধর্মই ঐতিহ্য।" "মানববৃত্তির উৎকর্ষনেই ধর্ম।" হিন্দুরা ধর্ম শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। 'ধর্ম কখন রিলিজিয়নের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও কখনও পুণ্যকর্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়। এমনকি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিজ্ঞানও ধর্ম শব্দটির অন্তর্গত। তাছাড়া সব ধর্মমতের অন্তঃস্থিত নিত্য পদার্থই হল ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির সম্যক অনুশীলন ও পরিচালনই ধর্ম। স্বার্থপরভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অথবা আত্মতৃপ্তির পথের অনুসন্ধানে তাঁর মতে সর্বপ্রকার সন্ন্যাসের মতই ব্যবহারের অযোগ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে অনুশীলন বা কৃষ্টির মানে হলে জগতের সঙ্গে একাত্মতা, তার প্রতি বিমুখতা নয়। জাতিগঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্মসংস্কৃতি বা work ethic এর উপর এই গুরুত্ব প্রদান বঙ্কিমের সমাজ ও ধর্মের মিথষ্ক্রিয়ার সচেতনতার পরিচায়ক। তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন "সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না ... অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম বলিনা। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ, সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম, অনুশীলন কর্মাত্মক। নিস্পৃহা অনুশীলন তত্ত্বের পরিপূরক। কোঁৎ-এর মানবতাবাদের উন্নততর রূপ তিনি হিন্দুধর্মে দেখেছিলেন। মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর ভক্তির অন্তর্গত। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দু ধর্মে অভিন্ন, অভেদ্য।"

এখানে একটা সমস্যা দেখা যায়। মানবজাতির সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই যদি ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তাহলে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ এই দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের জাগরণের জন্যই হিন্দুধর্মে বিধৃত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানোর প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ব-এ তাই খানিকটা খাপছাড়াভাবে হলেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।"

স্বদেশ রক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের প্রতি কর্তব্যের ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। পাশ্চাত্যের ইহলৌকিকতার প্রশংসা করলেও তিনি তার আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে "দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি'র মধ্যে নূতন ভারসাম্য গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীকে। প্রাচীন ভারতীয়রা "দেশপ্রীতি সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।" এটা ছিল মস্ত বড় ভুল। বিশ্বহিতৈষণা যত বড় উচ্চ আদর্শই হোক না কেন তা দেশের প্রতি কর্তব্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে শরীরচর্চা এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষার মাধ্যমে দেশের স্বার্থরক্ষার মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে বঙ্কিম বলেছেন "আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্মের ফল ভোগ করিতেছি। এই কারণেই তিনি পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লিষ্ট বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের বাহুবল অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। হিন্দু মেলার প্রেরণায় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল তা নিঃশব্দে বঙ্কিমের নূতন ধর্মের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শারীরিক শক্তির বিকাশকে তিনি "অনুশীলন" এর অন্যতম অঙ্গ বলেছেন। বাহুবল মানসিক শক্তিরও দ্যোতক। "উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।"

হিন্দু ধর্মের এই অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র হৃতগৌরব বাঙালি তথা ভারতীয়দের স্বাজাত্যাভিমানকে জাগ্রত করতে চেয়েচেন। হিন্দুধর্মের জন্য ভারতীয়দের শ্লাঘা বোধ করা উচিত। কারণ হিন্দুর কাছে কেবল ঈশ্বর ও পরকালই ধর্ম নয়, 'ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম।" গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের মহত্তম আদর্শ। সমস্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণের মহত্ত্বের মূখ্য কারণ। হিন্দু ধর্মের মধ্যে হিন্দু সমাজের উজ্জীবনের সূত্র সন্ধানের জন্য বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টার সাথে পরবর্ত্তীকালের প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক মাক্স ভেবারের প্রটেস্টান্ট ধর্মের নীতিবোধের মধ্যে আধুনিক পশ্চিমী সমাজের ঐহিক জীবননিষ্ঠা ও যুক্তিসিদ্ধ কর্মোদ্যোগের সূত্র সন্ধানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর কালে ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীরা যে হীনবল ও হৃতগৌরব হয়ে পড়েছিল একথা বঙ্কিমকে মানতেই হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব এবং অবক্ষয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মতামত বাক্‌ল এবং লেকির বক্তেব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করেন এবং ম্যালথাসের তত্ত্বকেও তিনি কাজে লাগান। বাক্‌লেকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়া এবং মাটির উর্বরশক্তি প্রসূত খাদ্যপ্রাচুর্যকে হিন্দুদের অন্তর্মুখীনতা এবং ঐহিক বিষয়ে উদ্যমহীনতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। লেকিকে অনুসরণ করে জ্ঞানতৃষ্ণা ও অর্থলিপ্সার মধ্যে দ্বিতীয়টিই "সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য কারণ" বলে বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্কিম। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টাই ইউরোপের অগ্রগতির চাবিকাঠি। আর ভারতবাসীদের অল্পে সন্তুষ্টি তাদের অধিক থেকে অধিকতর ঐহিক সুখের অনুসন্ধানে পরান্মুখ করেছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ধনবৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধির অনুপস্থিতি। জনসংখ্যা এবং ধনের তারতম্য দূরীকরণের উপায় জনবহুল দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশান্তর গমন এবং অধিবাসীদের বিবাহ প্রবৃত্তি দমন। ভারতে এই দুইটির কোনটিই না হওয়ায় ভারতের জনগণের দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলি বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন মানবজীবনে দুঃখের নিবৃত্তি থেকে জ্ঞান এবং শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের আধার আত্মায় নির্বাণই তাদের একমাত্র বিবেচ্য। এই কারণেই দেশে সন্ন্যাসের এত মাহাত্ম। জ্ঞান হল মুক্তির হাতিয়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারের মায়ার প্রতি ঔদাসীন্যই জ্ঞান। "হিন্দু সভ্যতার মূল কথা 'জ্ঞানেই মুক্তি', পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল 'জ্ঞানেই শক্তি'। পাশ্চাত্যে মানুষ শক্তি পেয়েছে কিন্তু আমরা কি মুক্তি

পেয়েছি বঙ্কিম প্রশ্ন তুলেছেন। "ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক ; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক তাই ইহকালে জয়ী হইলাম না। পরলোকে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।"

এখানে মাক্স মূয়েলারের সঙ্গে বঙ্কিমের মতভেদ সুস্পষ্ট। মাক্স মূয়েলার হিন্দুদের পারত্রিক আগ্রহকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন এবং সেটিকে হিন্দুদের গর্বের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম ভারতীয়দের পারত্রিক বিষয়ে ঝোঁক বেশী বলে মানলেও সেটাকে অবিমিশ্র হিতের উৎস বলে করেন নি। এ দিকে বরং পরবর্ত্তীকালের মাক্স ভেবারের মতের সঙ্গে তাঁর মতের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ মাক্স ভেবারের মতে বঙ্কিমও মনে করেছিলেন ইউরোপের জয়যাত্রায় একটি বড় কারণ তাদের যুক্তিবাদ এবং পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে আরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে আবিষ্কৃত সত্যকে বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা। পূর্বকালের হিন্দুদের মধ্যে এই প্রবণতার একান্ত অভাব ছিল।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয়দের শক্তিলাভের উপায়েরও ইঙ্গিত দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐহিক সাফল্য অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণে ঐহিক সুখের অনুসন্ধানে নিরন্তর ব্যস্ত স্বার্থপরতাকে তিনি সমর্থন করেননি। জীবনকে অস্বীকার করা হয় বলে তিনি সন্ন্যাসধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তার বিকল্প পরিতৃপ্তিহীন অর্থলিপ্সা নয়। সহমর্মিতা এবং সদ্বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশই মানুষের সুখলাভের একমাত্র পথ। উনবিংশ শতকে বস্তুবাদের নগ্নপ্রকাশ এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদের অপরিমিত আকাঙ্খার পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র "কার্যকারিণী বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধি এবং সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা" বোধ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কার্যকারিণী বৃত্তি ছাড়া আধুনিক ভারতের গতি নেই। কিন্তু সেই বৃত্তি বল্গাহীন প্রবৃত্তির ক্রীড়নক হবে না, সংযত হবে, নিয়োজিত হবে দেশের ও জাতির কল্যাণে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের মর্ম উপলব্ধির প্রচেষ্টায় বঙ্কিমের এই যুগোপযোগী সমাজবীক্ষা।

বঙ্গদেশের কৃষকদের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সাম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্য সমাজের আর একটি ভালো দিকের কথা 'সাম্য' প্রবন্ধের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। তা হল পাশ্চাত্যসমাজের সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার সুবিধা। তুলনায় ভারতীয় সমাজের শিক্ষার অধিকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল। হিন্দু সমাজব্যবস্থার এই সমালোচনা বঙ্কিম "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধেও বিস্তারিত ভাবে পেশ করেছেন। বস্তুতঃ 'বঙ্গ দর্শন'-এ প্রথম প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' প্রবন্ধ দুটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উজ্জ্বল নজীর হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালের মানুষ। তিনি অবশ্য জমিদার ছিলেন না বা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। চাকুরি সূত্রে তিনি বঙ্গদেশের কৃষকের দুরবস্থার কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি জোরালো ভাষায় এবং বাস্তবজীবন থেকে আহৃত বিপুল তথ্যের সাহায্যে কৃষকদের মর্মান্তিক দুঃখ দুর্দশার কথাকে লোকচক্ষে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধ বাস্তব জীবন থেকে তথ্য আহরণ (empirical) ও তার বিষয়নিষ্ঠ (objective) বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ও কুশলতার পরিচায়ক এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশহিতৈষণার ও সমানুভূতির (empathy) দ্যোতক। তিনি বলেছেন, "বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে।" সমাজবিজ্ঞানীর তথা বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সচেতনতা এই উক্তিতে জোরালো ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জমিদার মণ্ডলী এবং তাদের সমর্থকদের তিরস্কারের আশঙ্কা তাঁকে টলাতে পারেনি। কৃষিকর্মের এবং জীবনযাপনের তথ্য উপস্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উৎপন্ন শস্যের কিছুই

তো সে পায় না, বরং তাকে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা, আর ঋণের দায়ে সে হয় সর্বস্বান্ত। এই প্রসঙ্গে জমিদারদের নির্মম ব্যবহারের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন তা যেন 'নীলদর্পণ' নাটকের বিবরণকেও হার মানায়। তিনি লিখেছেন "জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ...জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"

ভারতের কৃষককুল তথা দরিদ্র শ্রমজীবীদের বঞ্চনার কারণ ছিল "জ্ঞানিক উন্নতির" বাহক ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য। এদেশে ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতার জন্য শ্রমোপজীবীদের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্তে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণেরা "জ্ঞানালোচনায় তৎপর" হতে পেরেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই শ্রেণীবিভাগ হবার ফলে উপরে শ্রেণী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানচর্চাকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখে জনসাধারণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। ধন ও জ্ঞানের অসম বন্টনের ফলে সমাজে ক্ষমতা বিভাজনেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্মৃতির বিধানগুলি শূদ্রদের নিপীড়ণের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। শ্রমজীবী জনতার ভাগ্যে জুটেছিল। "দ্রারিদ্য, অজ্ঞাত এবং দাসত্ব।" রাজনীতিতে তাদের উৎসাহের অভাব ক্ষমতার বন্টনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে দৃঢ় করেছিল, তাদের অজ্ঞতা ব্রাহ্মণসৃষ্ঠ কুসংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করেছিল, ধর্মে ইহলোকের প্রতি বৈরাগ্যের মনোভাবকেই কায়েম করেছিল।

মানুষে মানুষে অসাম্যের কুফলগুলি বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে বিশদ করেন। সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি শোষণ, অত্যাচার, দুর্নীতি, স্বার্থপরতার বাস্তব রূপ তিনি উদঘাটিত করেন। জগতে মানুষেরই দ্বারা কৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগে যুগেই প্রতিবাদ হয়েছে। ফ্রান্সের সাম্য প্রচেষ্টায় রুশোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। "ফরাসী বিপ্লব শমিত হইল, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বী রোপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। ইউরোপ তাহার ফলে পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইন্টারন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।" সেই যুগে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রচলিত সাম্যবাদী তত্ত্বের সাথে বঙ্কিমের যথেষ্ঠ পরিচয় ছিল। মার্ক্স-এর শ্রেণীর ভিত্তিতে সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণ বা শ্রেণী দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব অবশ্য তাঁর চিন্তায় ছিল না।

'সাম্য' গ্রন্থে ইংরেজ সমাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল-এর subjection of women গ্রন্থের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন তিনি। পশ্চিমের নারী সমস্যা এবং ভারতের নারী সমস্যার তুলনামূলক আলোচনায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন "আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপ বা আমেরিকায় তার শতাংশ ও নহে। আমাদের দেশ অধীনতার দেশ...এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে। এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্মযাজকের অদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী অন্যত্র তত নহে।" বড় বেদনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী।" তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা লক্ষ্য করে যে এ সমাজে নারীর ভূমিকা দাসীর। এমনকি স্বামীর সন্তোষের জন্য বঙ্কিমের সমকালে স্ত্রী তাঁর সপ্নীগণেরও পরিচর্যা করতে বাধ্য হত। বঞ্চনার অনেকগুলি দিক বঙ্কিম দেখিয়েছেন। পুরুষ বিদ্যাশিক্ষা করে, নারীর তা বারণ ; পুরুষ পুনর্বার বিবাহ করতে পারে, নারীর পক্ষে সেই সুযোগ নেই ; পুরুষ যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারে, নারী গৃহবন্দিনী পুরুষ স্ত্রী বেঁচে থাকতেই যথেচ্ছ বহুবিবাহ করতে পারে, নারীর পতির মৃত্যুর পরেও সেই অধিকার নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বৈষম্য দূর করে সাম্য স্থাপনের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিধবাবিবাহ তার কাছে যুক্তি সিদ্ধ বলে

মনে হয়েছিল। তবে কোনও বিধবা নারী তাঁর স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চাইলে তাঁর ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা অনেক শিক্ষিত বাঙালীর ক্ষেত্রে তিনি বিধবাবিবাহের মৌখিক সমর্থন ও বাস্তবে তা পরিহারের দ্বিচারিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিচমন্দ্র এও বলেছেন নারীকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সমাজ গুরুতর অন্যায় করেছে। এ বৈষম্য তাঁর কাছে ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ বলেও মনে হয়েছে।

'বঙ্গদেশে কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের বিচার ব্যবস্থারও তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু দুটি রচনাতেই তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি জমিদারবিদ্বেষী নন এবং তিনি ইংরাজবিদ্বেষকও নন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিচার

'জাতীয়তাবাদ' বিষয়টি নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব গভীরভাবে আলোড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদের পুরোধা হিসাবে মনে করা হয়। সন্দেহ নেই ঔপনিবেশিক শাসনের নানাবিধ অবিচার ও অত্যাচার, যার কিছুটা নিজের কর্মজীবনেও তিনি সহ্য করেছিলেন, এই জাতীয়বাদের উৎস। ভারতের ঐতিহ্য বিচার করে তার মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদের গর্বের উপাদনগুলি চিহ্নিত করার প্রয়াস এই জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। কিন্তু যে জাতির কথা তিনি গভীর আবেগের সাথে বলেছেন, সে জাতি বা 'নৈশনের' নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক পরিসীমা খুব স্পষ্ট নয়। কখনও তা ভারতের সব জাতির সংহতির রূপের সঙ্গে সমার্থক। আবার কিছু জায়গায় 'জাতি' বলতে তিনি কেবল হিন্দুদের বুঝিয়েছেন। অনেক সময়ে যেমন 'বন্দে মাতরম্' গানে তাঁর কল্পনায় বাঙালি জাতি, তার দুর্দশার সম্বন্ধে ক্ষোভ ও সেই দুর্দশার নিরাকরণের আশা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের পরাধীনতার সমালোচনা ও সেই শাসন অবসানের ক্ষেত্রে হীনবীর্য ভারতীয়দের চেষ্টার অভাবের জন্য ক্ষোভে ব্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত বঙ্কিমচন্দ্রও এদেশে ব্রিটিশশাসনের ঐহিক সুফল সম্বন্ধে প্রশংসার মনোভাবই দেখিয়েছেন। এর দ্বারা এদেশে ব্রিটিশ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসন সম্পর্কে হয়ত তাঁর অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এলিয়ট ও ডসন এর **হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া বাই ইটন ওন হিস্টরিয়ানস্ : দ্য মহমেডান পিরিয়ড** (১৮৫৪) গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যবনদের সম্পর্কে রিবূপ মন্তব্যও আছে। এর থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক ছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর রচনাবলীতে মুসলমান সম্পর্কে কিছু অযৌক্তিক মন্তব্যও দেখা যায়। বিষয়টি কিন্তু জটিল। কেন না মুসমিলদের সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অনুকুল মন্তব্যও করেছেন। এক জায়গায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় মুসলিমদের বাঙালীর তথা ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের ঐস্লামিক শাসনকে তিনি বিদেশী শাসন বলেন নি। তদুপরি তিনি লিখেছেন "চিত্তশুদ্ধি কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের সার এমন নহে, ইসলাম ধর্মেরও সার।" বুদ্ধিমার্গীয় ঔদার্য তাঁর পূর্ব্বাপর বজায় ছিল। তাছাড়া 'সীতারাম'-এর হিন্দু সাম্রাজ্যের মহম্মদপুর নামকরণের কথা বাদ দিলেও চাঁদ শাহ ফকির দিয়ে তিনি একথাও বলিয়েছেন "যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না এ কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হলে নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে এত তীব্র কঠোর তিরস্কার উচ্চারণ করতে পারতেন না। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিম লিখেছেন "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ...রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ...অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই

নিকৃষ্ট।" 'সীতারাম'-এর প্রথম সংস্করণে ফকির সীতারামকে বলছেন "তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।"

গ্রন্থপঞ্জী

১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম **বঙ্কিম রচনাবলী ১ম** খণ্ড (উপন্যাস) ও ২য় খণ্ড (প্রবন্ধ) কলকাতা, সাহিত্য সংসদ

২। পোদ্দার, অরবিন্দ **বঙ্কিম মানস** কলকাতা, উচ্চারণ

১৩.২ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

প্রস্তাবনা

সমাজবিজ্ঞানে বা সমাজসংস্কৃতির বিশ্লেষণে বাঙালি তথা ভারতীয়দের অবদান আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয় নি। সমাজ-সংসারের ঘটনা ও প্রক্রিয়ার বিচার বিশ্লেষণে, তার খুঁটিনাটি বিচারের, একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর নৈপুণ্য সম্বন্ধে হয়ত একটা সংশয় থাকে। কিন্তু এই জায়গাতেই বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার বৈশিষ্ট্য। সন্ন্যাসী ছিলেন বলেই পক্ষপাতহীন নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় ও প্রতীচ্য সমাজব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। আর ধর্ম ও ধর্মমতের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কের সয- পর্যবেক্ষণই এই বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল।

জীবনী ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে সমাধিস্থ অবস্থায় লোকান্তরে গমন করেন। তাই তাঁর আপন কর্মের পরিবেশ ও পরিসর ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ঊনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্ম জিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছিল ধর্মপ্রাণতা, পার্থিব নীতিবোধ এবং সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতার সংমিশ্রণে। সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা জরুরী হয়ে পড়েছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইউরোপীয়দের ঐতিহ্যের সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায়। বিবেকানন্দ খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ইউরোপীয় সমালোচকদের প্রবল প্রতিস্পর্ধা জানান। তাঁর মধ্যে আমরা এমন এক অবিসংবাদী দেশপ্রেমী ভারতীয়কে দেখি যাঁর জীবনযাত্রার মূলসুরটি হিন্দু ঐতিহ্যের তারে বাঁধা ছিল। "ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বে" দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজের মূল্যায়ন করেছিলেন। সে যুগের ইউরোপ আফ্রো এশিয় সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে যে হীনম্মন্যতার সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিবেকানন্দের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না।

হিন্দু-মুসলিম ও নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের পারিবারিক ঐতিহ্য

বিবেকানন্দের পরিবার ছিল বর্ণে কায়স্থ। বহু পুরুষ যাবৎ তাঁরা মুসলিম শাসকদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁরা ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম পর্বের এলিট সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে গণ্য হন। বিবেকানন্দের প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য উপকরণ নিয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন তিনি। বিবেকানন্দের পিতামহ দুর্গপ্রাসাদও এ্যাটর্নী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিবেকানন্দের বহু ভাষাবিদ্ পিতা বিশ্বনাথ দত্তও একজন সফলকাম ও খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নিজের এবং সকলের ঐহিক সুখেই তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারের সমালোচনা করে গ্রন্থও রচনা করেছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। বিশ্বনাথের পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল হিন্দু মুসলিম ও নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে।

সাংস্কৃতিক ঔদার্য ও হিন্দু ঐতিহ্যানুরাগের সহাবস্থান

সাংস্কৃতির ঔদার্যের পাশাপাশি প্রচলিত রীতিনীতি এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম-এবং সহজ সরল ধার্মিকতা থেকে দত্তপরিবার বিচ্যুত হয় নি। পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই এই হিন্দু ধার্মিকতার ঐতিহ্য বেশী প্রবল ছিল। শৈশবে

মায়ের কাছে শোনা গল্পের মাধ্যমে হিন্দু ভক্তিবাদ এবং নৈতিকতার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়েছিল। আবার এই মায়ের কাছেই তাঁর প্রথম ইংরাজী শিক্ষা।

শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধা গ্রহণে পরিবার ও পরিবেশের উৎসাহ

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত যুবক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্যদের মতই ছিলেন। তবে তাঁর পিতা তাঁকে সব ধরণের বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। বস্তুতঃ মানুষ সম্বন্ধে কোন কিছুকেই সমীহ বা ভয় করা নরেনের চরিত্রে ছিল না। তাঁদের "সিমলে পাড়ার" যুবকদের প্রবল নির্ভীকতা তাঁর মানসিক গঠনকেও প্রভাবিত করেছিল ; দেশে বিদেশে সর্বত্র তর্কযুদ্ধে তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন।

বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার সাথে দেশের সমস্যার সমাধানের সন্ধান

নরেন্দ্রনাথ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইতিহাস ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। বিবেকানন্দের ইউরোপের ইতিহাস পঠন শুধুমাত্র জানার আগ্রহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় জীবনের নির্জীবতায় তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং কে জানে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে তিনি তাঁর সঙ্কটের মুক্তি খুঁজছিলেন কি না! সমকালীন আরও অনেকের মত তিনিও নিঃসন্দেহে ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যে ভারতের সমস্যাবলীর সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে তিনি যুগোপযোগী শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন প্রকার অনুকরণকে তিনি ঘৃণা করতেন। তবে তাঁর আনন্দময় প্রাণময় সত্ত্বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে, তার ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে যা পেয়েছিল গভীরভাবে তার রসস্বাদন করেছিল। পরাধীনতার গ্লানি এবং তজ্জনিত ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা সেই আনন্দকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি।

পার্থিব বিষয়ে আগ্রহের পাশাপাশি অস্তিত্বের মৌল সমস্যার সমাধান অন্বেষণ

নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতার পাশাপাশি ছিল যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তার আনুষঙ্গিক পার্থিব আশা-আকাঙ্খা। দর্শনে স্নাতক হওয়ার পর তিনি পিতৃবন্ধু অ্যাটর্নি নিমাই চন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠানে আর্টিক্ল্ড্ ক্লার্ক রূপে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি আইনের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রও ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় ব্যারিষ্টার হবার। পিতার মৃত্যুতে বিলাতে গিয়ে পড়াশোনার আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য তাঁর সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত অস্তিত্বের মৌল সমস্যার সমাধানের চিন্তা।

যুগপুরুষ রামকৃষ্ণের প্রভাবে সন্ন্যাসের পথে অভিযাত্রা

এই সমাধানের খোঁজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই সমধানের সন্ধান তিনি পেলেন রামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিত্বে ও বাণীতে। রামমোহনের কাল থেকে বাংলা তথা ভারতে নতুন সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলির ফলে ধর্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে যেমন একদিকে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার ও সূচনা হয়েছিল। সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিঘ্ন কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক উচ্চাশার পথে অন্তরায় নিয়ে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের অনতিক্রম্য দুঃখবোধ থেকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে এক ধরণের বিদ্বেষবোধের বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় ধর্মগুলির উপরে খ্রীষ্টান পাদরি এবং ইউরোপীয় সমালোচকদের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য তাঁকে তীব্র আঘাত করে। এই প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণদেবের সর্ব ধর্মসমন্বয়ের মতবাদ সকলের সপ্রশংসা এবং সানুরাগ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের পরেই নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সংশয়াতীত বিশ্বাস জন্মায়। তাঁরই নির্দেশে তিনি সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হন রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দ রূপে।

বিবেকানন্দের বিচারধারায় রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয়বাদের প্রভাব

বিবেকানন্দ এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বহুজনের মতে রামকৃষ্ণের জীবনে ধর্ম সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। সব ধর্মের সারমর্মই যে এক ঈশ্বরকে জানা ভারতের এই চিরপ্রচলিত বিশ্বাস রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিবেকানন্দ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে সারবাদী সহিষ্ণুতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর সেই শিক্ষা গভীর এবং সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতার চেয়েও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছিল এবং **ধর্মান্ধতা-মুক্তির মাপকাঠিতে তিনি সব ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করেছিলেন।**

পরিব্রাজনে দেশের মানুষের সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

রামকৃষ্ণের দেহাবসানের (১৮৮৬) পর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত পর্যটনে বের হন। শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে (১৮৯৩) যোগদানের পূর্বাবধি পরিব্রাজক রূপেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। **ভারতের মাটির কাছের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতা ও মননের পুষ্টি সাধন করে।** ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিস্টার ক্রিষ্টিনকে তিনি ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম। ...আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি।"

সর্বাত্মক নিরবচ্ছিন্ন সমাধির জন্য নরেনের আগ্রহকে স্বার্থপর বলে তিরস্কার করেছিলেন রামকৃষ্ণ ; মানবজাতির প্রতি নরেনের কর্তব্য ছিল যে ! কর্তব্য বলতে রামকৃষ্ণ দারিদ্রমোচন বুঝেছিলেন কি না তা বোঝা যায় না। পরিব্রাজক রূপেই বিবেকানন্দ প্রথম দেশের দরিদ্রশ্রেণীর বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। দেশব্যাপী ভয়াবহ দারিদ্রের অভিজ্ঞতার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য তাঁর গর্ববোধ ভীষণ রকম ধাক্কা খেয়েছিল। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জীবরূপী শিবের সেবার যে মন্ত্রের অনুসরণ করেছিলেন আমরণ তার অন্যতম মূল এখানেই যদিও গুরুর কাছ থেকে তিনি জীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করার শিক্ষা আগে পেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের দুই মূল সূত্র

বিবেকানন্দের চিন্তা ও কাজের দুটি মৌলিক সূত্র ছিল। প্রথম, আধ্যাত্মিকতা এবং তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যে ধর্ম তাই ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের এবং তাঁর বিদেশযাত্রার প্রধান উপলক্ষ। দ্বিতীয়টি হল বিবেকানন্দের গভীর জাতীয়তাবাদী মানসিকতাপ্রসূত দেশবাৎসল্য। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ভারতের সনাতন ধর্মের বাণী পৌঁছে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর যোগদানের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল। আর তাঁর বিদেশযাত্রার অন্তর্লীন উদ্দেশ্য ছিল দেশের জনসাধারণের সেবার্থে অর্থসংগ্রহ।

শিকাগো বিশ্বমেলায় (১৮৯৩) যোগদান

শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের দ্বারা পশ্চিম ভারতের আধ্যাত্মিক বিজয়ের শুরু। একই সঙ্গে উদ্বোধনী অভিবেশনে ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীতে এ-কথাই বেশী ফুটে ওঠে ধর্ম নয়, রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বামীজীর তীব্র সমাজসচেতনতা তাঁকে ভারতীয় সমাজের বাস্তব অবস্থা কখনও ভুলতে দেয়নি। বেদান্তের বাণী বিশ্বজনীন হতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সেই বাণী প্রচারের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় বিদেশে খেকেছেন। প্রতীচ্যের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক মুক্তি মানবসমাজের নবদিগন্ত উন্মোচন করবে। এই আধ্যাত্মিক মুক্তি ভারতের বেদান্তর উপলব্ধির পথেই আসবে। এবং তারই ফলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য দেশবাসীর গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হবে এবং তারা ভারতের দারিদ্র্যমোচনে নানাবিধ সাহায্য প্রদান করবে। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের পরে তিনি লিখেছেন “তাদের আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাবে এবং তাদের সমাজের যা কিছু ভাল তা আমরা গ্রহণ করব।” পরের মাসেই আর এক বন্ধুকে লেখেন, “এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে।” এই অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন তাঁর দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ১) শিক্ষাবিস্তার এবং ২) সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্রের মঙ্গলবিধান।

আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণ

শিকাগো সম্মেলনের পরে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় যান। মার্কিন দেশ সফরের (১৮৯৫) পর তিনি লন্ডনে যান। এখানে বহুসভায় অগণিত শ্রোতৃবৃন্ধ তাঁর বর্ক্তৃতায় মুগ্ধ হয়। এখানেই আইরিশ বিপ্লবীদের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ মিস্ মার্গারেট নোবেলের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর এই কন্যাসমা শিষ্যা গুরুর দীক্ষাগুণে নিরক্ষর ভারতীয়দের সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বনির্ভরতার উদ্বোধনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। ইংল্যাণ্ড প্রবাসের মাস তিনেক পরে মার্কিন দেশে ফিরে গিয়ে একটি বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করেন বিবেকানন্দ। ঐ বছরেই স্বদেশে ফেরার পথে লণ্ডনেও একটি প্রাচরকেন্দ্র স্থাপন করেন তিনি। ১৮৯৭ সালে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে কলম্বো এবং দক্ষিণ ভারতের পথে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করে বিবেকানন্দ কলকাতায় উপনীত হন। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর কাজ হল জনসাধারণের মানসিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য এবং জনগণকে বেদান্ত ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহিত করার জন্য একদল সন্ন্যাসী কর্মীকে শিক্ষিত করে তোলা।

১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান দপ্তর বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়। মিশন প্রতিষ্ঠার পর সমাজসেবাই হয় বিবেকানন্দের প্রধান কাজ। ১৮৯৭ সালের মে মাসে তিনি প্রচারের কাজে ভারত পরিভ্রমণে যান। ১৮৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে বেদান্ত শিক্ষার তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। এরপর প্যারিসে Congress of History of Religons এর অধিবেশনে যোগ দেন। ফ্রান্সে তিন মাস কাটিয়ে গ্রীস, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁর দেহ ও মনে তীব্র ক্লান্তি। বেলুড়ে বন্ধু সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বামীজী মায়াবতী চলে যান। সেখান থেকে যান পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যটনে। শরীর ও স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য সুবিখ্যাত জাপানী প্রাচ্যবিদ্ ও শিল্পী ওকাকুরার আমন্ত্রণে তিনি টোকিও যেতে পারলেন না। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর জীবনাবাসন হয়।

বিবেকানন্দের সমাজজিজ্ঞাসার মূল ও প্রকৃতি

বিবেকানন্দের ক্রিয়াকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বিবেকানন্দের ধর্মচর্যা জীবন বিমুখ ও

সমাজবিমুখ ছিল না। **তাঁর মতে ধর্মচর্যার প্রকৃতি ব্যক্তি এবং দেশ ও সমাজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হবে।** পার্থিব বৈভবে সমৃদ্ধ রজোগুণে বা প্রবল কর্মোদ্যোগে সমুজ্জ্বল প্রতীচ্যজনের পক্ষে ভোগবাদের থেকে উত্তরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার অনুসরণ একপ্রকার ধর্মাচরণ। কিন্তু পরাধীন দারিদ্র্যপীড়ত ভারতবাসীর ধর্ম হবে তমোগুণ বা সর্বপ্রকারের নিশ্চেষ্টতা, দুর্বলতা পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুপ্রথার অবসনের জন্য রজোগুণ বা কর্মোন্মাদনার উদ্বোধন।

বিবেকানন্দের সমাজজিজ্ঞাসার সাথে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের এক বিস্ময়কর মিল পাওয়া যায়। সামন্ততান্ত্রিক ও সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিপর্যয় ও অবসান এবং আধুনিক ও অর্বাচীন শিল্প সভ্যতার জন্মের সন্ধিক্ষণে সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধানের চেষ্টা থেকেই পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের শুরু। তাঁর সুবিখ্যাত রচনা **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-এ** পরিশিষ্টে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন আমাদের দেশেও একই ধরণের সমস্যা দেখা গিয়েছিল আমাদের সংস্কৃতির ওপরে ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাতের ফলে। "পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিস সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া দাওয়া ঘর-দোর সমস্ত [তে]ই একুট সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল। এখন একে দারিদ্র্য তার ওপর আমরাইতো নষ্ট ভ্রষ্ট [ইহা দ্বারা বা হইতে নষ্ট এবং তাহা দ্বারা বা হইতে ভ্রষ্ট] হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল তাও যাচ্ছে পাশ্চাত্য দেশেরও কিছু পাচ্ছি না। চলা-বলা কথাবার্ত্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারই সামর্থ্য নেই। **পূজাপাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, আর কালের উপযোগী একটা নতুন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।**" মধ্যরেখার এই দুর্দশা যে অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্ম দিয়েছিল তার থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার জন্যই সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নির্মোহ বিশ্লেষণ দরকার ছিল।

বিবেকানন্দে সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আপেক্ষিকতার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে হীনবল প্রাচ্যের আপাত পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে পাওয়া যাবে ন। আবার পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুরই যুক্তিহীন বিরূপ সমালোচনা ও আপন সমাজের সবকিছুর প্রতি নির্বিচার আনুগত্যও সমাজের দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় নয়। যুক্তিভিত্তিক তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি ভিন্ন সমাজ বা সংস্কৃতির বা জীবনাদর্শের বিশ্লেষণ করলে তুলনীয় দুটি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটির দোষ ও গুণ বোঝা যেতে পারে এবং তার থেকেই তাদের বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তনের দিশাও হয়ত মিলতে পারে। কিন্তু এই তুলনা বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এটা বোঝা দরকার যে "প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। **তাদের চোখ তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।**" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পঃ ১৯৬) স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিতে আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বহু অনুসৃত সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার (Cultural Relativity) ধারণার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর (Empirical) পদ্ধতির ওপরে গুরুত্ব প্রদান

যে কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক তথ্য বা ঘটনা তার সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। এবং কোন তথ্য বা ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য যথাসম্ভব সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যাক্ষানুভূতির উপর জোর দিয়েছেন বিবেকানন্দ। শোনা কথা নয় নিজের চোখে দেখা বা নিজের অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এবং যে কোন অনুমান বা সিদ্ধান্ত যাচাই করার জন্য তার **প্রায়োগিক সফলতার বিচার** তাঁর কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারে ভাগ্যবিপর্যয় ও দারিদ্র্য নেমে এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতার পরেও নরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর দারিদ্র্যে ভয়াবহ প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে নি। সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজক রূপেই কয়েক বছর ধরে দারিদ্র্যের নগ্নরূপ দেখার পরই বিবেকানন্দ ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বারবার বুভুক্ষার জ্বালার কথা উল্লেখ করেছেন।

অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা (Empathy)

সামাজিক সম্পর্ক বা ঘটনার যথাযথ অনুধাবনের জন্য আরও প্রয়োজন অবেক্ষণাধীন মানুষজনের বোধ এবং আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা। ভিক্ষা বা দানের উপর নির্ভরশীল বিবেকানন্দের মত তাঁর অন্যান্য সতীর্থ সন্ন্যাসীরাও নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের নগ্নরূপ দেখেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে বলা যায় যে তাঁর গভীর মানসিকতার উর্বর ক্ষেত্রে দারিদ্র্যপীড়িত ভারবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও তাদের দুঃখ দূর করার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মধারার বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার পর যখন তাঁর গুরুভাইরা তাঁর দেশব্যাপী সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, জনসেবা, সমাজোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে পশ্চিমী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভ্রমণেরই কুফল এবং গুরুদেব রামকৃষ্ণের নির্দেশিত ভক্তিমার্গ সাধনা থেকে বিচ্যুতি বলে সমালোচনা করেছিলেন, উত্তেজিত বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমি রামকৃষ্ণ বা অন্য কারুর চাকর নই। আমি কেবল তাঁরই দাস যিনি নিজের মুক্তির তোয়াক্কা না করে অপরের সেবা করেন, পরকে সাহায্য করেন।"

অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রতি সমবেদনা এবং শোষিতের হয়ে সওয়াল করা যে বিবেকানন্দের সমকালীন বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক চেতনায় ছিল না, তা নয়। নীলচাষীদের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্বন্ধে বঙ্কিমের আবেগপূর্ণ বিহরণ এই ধরণের সমবেদনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এই মনোভাবকে কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করার কোনও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা তখনও দেখা যায় নি। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে জনসাধারণ অবিসংবাদিত ভাবে "ওরা"। সেই জায়গায় বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে নূতন ভারতবর্ষের জন্ম হবে "চাষার কুটীর ভেদ করে, কারখানা থেকে।" এবং নিজে তিনি দেশে বিদেশে অনুক্ষণ চেষ্টা করেছেন কী করে ঐহিক সমৃদ্ধিতে বলীয়ান পশ্চিম থেকে ভারতীয়দের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আর্থিক ও অন্যবিধ সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করবেন সেখানকার মানুষজনের মধ্যে বেদান্তের জ্ঞান বিতরণের প্রতিদান হিসাবে।

ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক

ভারতীয় সন্ন্যাসীর ভূমিকা পরিবর্ধনে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান

প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে যথার্থই বলেছেন যে বিবেকানন্দের মিশনারী কাজকর্মের ফলে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের জীবনে এক নূতন দিগন্ত উন্মেচিত হয়েছিল। নানাবিধ সমাজ-সেবামূলক কর্ম ভারতীয় সন্ন্যাসী ও মঠবাসীদের একটি বৈধ এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে বিবেচিত হল। নিজের ইহজাগতিক

সুখ-দুঃখে উদাসীন থেকেও জীবরূপী শিব সাধারণ মানুষের সেবার যে আদর্শ তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য রেখেছিলেন তা তাঁর পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির আদর্শ হিসেবে কাজ করেছেন। ভারতবর্ষের সমাজজীবনে ধর্ম ও সন্ন্যাসীর ভূমিকা নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে। সর্ব ধর্ম সমন্বয় সাধন পথের পথিক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের উদাহরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে বেশভূষা এবং তিলকাদি নিয়ে যে ভেদাভেদ ছিল তার প্রশমনের সূচনা হয়। গেরুয়া বসন সফল হিন্দু সন্ন্যাসীরই সাধারণ বেশ হিসেবে গণ্য হয়।

ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও সমাজভেদে ধর্মমতের বিভিন্নতা : দুরখ্যইম ও হ্বেবারের সঙ্গে তুলনা

বিবেকানন্দের চিন্তায় সমাজ এবং ধর্ম ও ধর্মমতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বিষয়ে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রথপ্রদর্শক এমিল দুরক্যইমের (Emile Durkheim) মতে পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। দুইজনেই হিতবাদীদের (Utilitarians) মতকে খণ্ডন করেছেন। হিতবাদীদের মতে ব্যক্তির স্বার্থ ও আপন হিত বা সুখের অন্বেষণ ও বিচার-বিবেচনাই সমাজ বন্ধনের মূল। বিবেকানন্দ দুরখাইমের পূর্বেই দেখিয়েছেন যে হিতবাদ এবং ব্যক্তিগত সুখ ভোগেচ্ছা কখনই সমাজবন্ধনের ভিত্তি হতে পারেনা। সমাজ বন্ধনের নীতি হল নীতিবোধ। ধর্ম এই নীতিবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব নীতিশাস্ত্রই ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়। "নীতিশাস্ত্রের উপদেশ 'স্বার্থ নয়, পরার্থ'। ...নীতিশাস্ত্রের গণ্ডী, লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবই হইল এই অহং এর নাশ, উহার বৃদ্ধি নয়।" দুরখাইম-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের মৌলিক পার্থক্যও আছে। দুরখাইম ইহজাগতিক সমাজকেই ধর্মের ও ধর্মমতের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক সমাজই তার অস্তিত্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মূলবোধের সূচক পবিত্র বা sacred বিষয়সমূহ অন্যান্য আটপৌরে বা Profance বিষয় থেকে আলাদা করে রাখে। এবং Sacred সংক্রান্ত সামূহিক বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান ও সংগঠন হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্র। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ কিন্তু পারমার্থিক এবং ইহজাগতিক চিন্তাভাবনা ও সেই সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে আলাদা করে দেখেননি এবং সেই কারণেই ইহজগতে মানবিক সম্পর্কের জটাজালকেই ধর্মের ভিত্তি বলে বিবেচনা করেন নি। 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা" তথা "ইন্দ্রিয় ও বিচার শক্তির সীমা অতিক্রম" করতে পারাকেই ধর্মের ভিত্তি বলেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সতত ক্রিয়াশীল চৈতন্যস্বরূপ অসীম সত্ত্বার সসীম মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাই ধর্ম। এই ঐক্যানুভূতির অভীপ্সা সব ধর্মের দেখা যায়। তাই সব ধর্মই মূলতঃ এক। অবশ্য সমাজভেদে ধর্মমত আলাদা আলাদা হতে পারে। "সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য [গণ] বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন।" ('ধর্ম কি' **বাণী ও রচনা** ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬)। বিবেকানন্দ 'ধর্মমত বা সম্প্রদায় সমূহের উপাসক' হিসেবে আচরিত সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন।

একই সঙ্গে ধর্মমত ও সমাজের সম্পর্ক প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ইউরোপের আর একজন পথপ্রদর্শক সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হ্বেবারের (Max Weber) চিন্তাধারারও আগাম আভাস দিয়েছেন। হ্বেবারের মত বিবেকানন্দ কোনও বিশেষ সমাজের বিশেষ সময়ের ধর্মবোধ ও ধর্মমতের সঙ্গে সেই সমাজ ও সময়ের ঐহিক সমৃদ্ধির যোগসূত্রটিকে পরিস্ফুট করেছেন। ধর্মের বাণীর কীভাবে জীবনে আচরিত হয় তার ওপরেই সমাজের ঐহিক বিকাশ নির্ভর করে। "বুদ্ধই বলো আর যীশুই বলো.... তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী। বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন ?.. বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ !! **তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীয়গণ প্রটেস্টান্ট** (Protestant) **হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে**

ফেলে দিল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্লফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মতে ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশকোটি লোক, দেরি হচ্ছে। ত্রিশ কোটি লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা খণ্ড ৬ পৃঃ ১৫৬-১৫৭, নিম্নরেখ সংযোজিত। হ্বেবার ও বিবেকানন্দ উভয়েই পশ্চিমী দুনিয়ার ঐহিক উন্নতির সঙ্গে প্রচেষ্টান্টদের ইহজীবন-নিষ্ঠার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু দুজনের মতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। হ্বেবার পশ্চিমী সভ্যতার আধুনিকতা ও ধনতন্ত্রের মূল আবিষ্কার করেছেন পরম্পরার অতিক্রমণে এবং মুনাফার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নূতন পথের ঝুঁকি গ্রহণের মধ্যে। তা সম্ভব হয়েছিল প্রটেষ্টান্ট নীতিবোধের ইহজাগতিক ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য। অন্যদিকে হ্বেবার দেখেছিলেন যে ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশীয়গণ পারমার্থিকতা এবং জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ ও পরলোক নিয়েই মগ্ন। এইটিই ভারতের ইহজগতে তাদের পশ্চাদ্গামিতার কারণ। তাই হ্বেবারের বিশ্লেষণে ভারতীয়দের মোক্ষাভিমুখী ধর্ম ও যুক্তিহীন মন্ত্রনির্ভর ধর্মাচরণের প্রতি অনুকম্পাই দেখানো হয়েছে। বিপরীত ক্রমে বিবেকানন্দ ভারতীয়দের উৎকর্ষ দেখেছিলেন তাদের আধ্যাত্মিকতা ও চতুবর্গসাধনাশ্রয়ী (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) ধর্মাচরণের মধ্যে। অবশ্য তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব বিবেকানন্দ এড়িয়ে যান নি। তাঁর সমাজবিশ্লেষণে ইহজাগতিক ব্যাপারে ভারতীয়দের পিছিয়ে পড়ার কারণ দ্বিবিধ ১) ইংরাজদের রাজনৈতিক শাসন সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এবং অর্থনৈতিক শাসন ও শোষণের ফলে পরাধানী ভারতবাসীরা হতোদ্যম, পরনির্ভরশীল ও পরানুচিকীর্ষু হয়ে পড়েছিল। ২) ভারতীয়দের হীন ঐহিক অবস্থার আর একটি বড় কারণ ছিল ধর্ম বিষয়ের প্রতি তাদের অতিরিক্ত অনুরাগের মধ্যে নয়, যথাযথ ধর্মানুষ্ঠানে তাদের ব্যর্থতায়।

বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় প্রত্যেকের গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে আধ্যাত্মিকতার অর্থাৎ অসীম ব্রহ্মের সাথে সসীম জীবাত্মার মিলনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। "আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস- এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে।" আশ্রমগুলির কোনটিই অন্যটির চেয়ে বড় নয়। গৃহস্থ সামাজিক কর্তব্য করেন এবং সন্ন্যাসী কেবল ঈশ্বরোপসনা করেন। বিবেকানন্দ নিজে সন্ন্যাসী হয়েও বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৮) "সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর একথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবন যাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ।" বিবেকানন্দ মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে কীভাবে শাস্ত্রে গৃহস্থকে তার স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি অতিথির প্রতি তার দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে "যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে।" কেন না "গৃহস্থই **জীবন ও সমাজের** কেন্দ্র। অর্থোপার্জন এবং সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের কথায় ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে "সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ের মধ্যেই আমরা ঈশ্বর ও তাহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব প্রণোদিত আত্মসর্ম্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশমাত্র দেখিতেছি।" মহানির্বাণ তন্ত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোকে বলা হয়েছে "গৃহস্থ য-পূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করবে এবং ব্যসন (দ্র্যত ক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করবে।" এই গুণগুলিই তো হ্বেবার প্রটেষ্টান্ট নীতিবোধ এবং আধুনিক ধনতান্ত্রিক চেতনার একান্ত বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাই হ্বেবারের এই মত আদৌ ঠিক নয় যে ভারতীয় ঐতিহ্যে ইহজগৎকে তুচ্ছ করে পারমার্থিকতার সন্ধানকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

আধুনিককালে ভারতীয়দের ঐহিক সমৃদ্ধি নেই কেন ?

বিবেকানন্দের মতে তাঁর সমসাময়িক ভারতবর্ষে অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণ ধর্মসম্বন্ধে তাঁর সমকালীন দেশবাসীর সঠিক ধারণার অভাব ও সার্বিক দৌর্বল্য। "এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ওই ধর্মের অভাব।?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। তিনি ধর্ম ও মোক্ষর মধ্যে তফাৎ করেছেন। "ধর্ম কি ? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।" আর "মোক্ষ কি ?— যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলোকেরও তাই।" মোক্ষ হল প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যাওয়া, শরীরবন্ধনের বাইরে যাওয়া, দাসত্ব হলে চলবে না। বিবেকানন্দের মতে "এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।...তবে পরে অন্যত্রও হবে।" তাঁর বিবেচনায় "এককালে এই ভারতে, এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন।" (৬÷১৬২)। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মের অর্থাৎ সাংসারিক কর্তব্যপালন অপেক্ষা মোক্ষের উপরে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। "হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।" ...বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই। এটাই শাস্ত্রের মত।" (৬÷১৫৩-১৫৪) ভারতবর্ষের মানুষ তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেই তাদের পার্থিব দৈন্য ও আত্মিক অবনতি। বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন "মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন— দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ ? গৃহস্থই নও— আবার মোক্ষ।"

তমোগুণের বদলে রজোগুণের অনুশীলন

বিবেকানন্দ তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে এটাই দেখিয়েছেন যে ভারতবাসীদের ঐহিক পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ তাদের মধ্যে তমস্ বা জাড্যের প্রাবল্য। সাংখ্য দর্শনের মতে মানবপ্রকৃতিতে তিনটি উপাদান রয়েছে— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমস্-এর অন্ধকার। এর লক্ষণ কর্মহীনতা বা জড়তা। তামসিকতায় আচ্ছন্ন মানুষ কর্মবিমুখ, অকর্মণ্য ও অলস। রজোগুণের লক্ষণ কর্মশীলতা বা ক্রিয়াশীলতা যা আকর্ষণ বা বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত। আর সত্ত্ব হচ্ছে সমতা বা আগের দুটি গুণের অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতার সামঞ্জস্য। প্রকৃত সত্ত্বগুণের বিকাশ হলেই আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তা অসীম সত্তার সঙ্গে সসীম মানুষের মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তখন আর জাগতিক ব্যাপারে স্পৃহা থাকে না। বিবেকানন্দ তাঁর সমসাময়িক ভারতীয়দের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য দেখেছিলেন। তমোগুণের নিষ্ক্রিয়তাকে সত্ত্বগুণের স্পৃহাশূন্য এবং স্পৃহাযুক্তক্রিয়া শূন্য অবস্থার সঙ্গে দেশবাসীর গুলিয়ে ফেলেছে। তাই প্রথমেই দরকার রজোগুণের প্রবাহে এই তমসাবৃত অবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা। প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগ এমনকি ঐহিক সুখভোগেচ্ছা পূরণের জন্য অবিরত কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের দরকার। এখানে পশ্চিমী জগৎ ভারতের উদাহরণ হতে পারে। তবে রজোগুণের উদ্দীপনায় আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্থাৎ স্বার্থশূন্যতার বোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হলে চলবে না।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় সমাজে এ পরিবর্তন সম্ভব। এক সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতের কালে সংসার নিষ্ঠা বা ঐহিক জীবন নিষ্ঠা ও পারমার্থিকতার সন্ধানের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। পরবর্তীকালে মোক্ষের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করতে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু আবার এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতিস্পর্ধা এই সুযোগ এনে দিয়েছে।

ভারতের জাতিব্যবস্থার বিশ্লেষণ

বিবেকানন্দের মতে ভারতের জাতিব্যবস্থা অচল, অনড় ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন—

১) জাতি ব্যবস্থা একটা মস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করত। এক জাতিভুক্ত লোকেরা সম্মিলিতভাবে সমাজকর্তব্য স্থাপন করত।

২) জাতিব্যবস্থার দুষ্ক্রিয়া ছিল দ্বিবিধ।

ক) এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগকে ব্যাহত করেছিলেন। উদ্যমহীনতার ফলেই ভারতীয়রা রাজনৈতিক পরাধীনতার শিকার হয়েছিল।

খ) নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণা সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়েছিল। অস্পৃশ্যাতার মত পাপের দুর্ভোগ থেকে মুক্তির জন্য নিম্নবর্ণের লোকেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

৩) অথচ জাতব্যবস্থা যে অপরিবর্তনীয় ছিল না নয়।

ক) বহু ক্ষেত্রে নিম্নজাতিবর্ণেভুক্ত লোকেরা ক্ষমতা অর্জন করে উচ্চবর্ণে আসীন হয়েছে।

খ) শাস্ত্রগুলিতেও দেখা গেছে যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিম্নবর্ণের প্রতি কঠোরতা কমে গেছে।

বিশ্বসমাজ পরিবর্তনের সূত্র

বিবেকানন্দ জাতি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তিনি বর্ণব্যবস্থার রূপককে বিশ্বসমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যার কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মতে মানবসমাজ ব্রাহ্মণদের শাসনের যুগ থেকে ক্ষত্রিয় ও শূদ্র অভ্যুত্থানের যুগে এসে পৌঁছেছে। যুগপুঞ্জিত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে শূদ্রদের এই উত্থান অপ্রতিরোধ্য। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মেটানোর জন্য অর্থনৈতিক সামাজিক সাম্য তীব্রভাবে কামনা করেছিলেন। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে এবং সর্বহারার দল নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রিক প্রশাসনের মাধ্যমেই এই সমাজতন্ত্র আসবে এমন কোন ইঙ্গিত তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। বর্ণ বা জাতিকে শ্রেণী হিসেবেও দেখান নি তিনি।

উপসংহার

বিবেকানন্দ এক সন্ন্যাসী হলেও সমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুক্তমন নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন স্বদেশের ও বিদেশের সমাজ নিয়ে। এই তুলনায় পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ বা বৌদ্ধিক অধীনতা ছিল না, আবার স্বদেশের সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগও ছিল না। বিদেশে ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর আর স্বদেশীদের সমালোচনা করে তাদের সমস্যা উত্তরণের পথও দেখিয়েছিলেন। এই সব করাণেই তাঁর চিন্তা ভাবনা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রায়চৌধুরী, তপন **ইউরোপ রিকন্সিডার্ড**

২। স্বামী বিবেকানন্দ **বাণী ও রচনা** ৬ষষ্ঠ খণ্ড